শ্রীশ্রীসদ্ভাবতরঙ্গিণী।

প্রথম খণ্ড।

অবধূত লোকগৌরব

শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা লিখিত।

প্রকাশক—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ, বি, এল।

প্রাপ্তিস্থান—ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার চৌধুরী
পোঃ খানখানাপুর, ফরিদপুর।

মূল্য আট আনা মাত্র।

উদ্বোধন।

এই ভারতবর্ষে পঞ্চবিধ উপাসক সম্প্রদায় অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান। যে স্থানে উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা, সেই স্থানেই ভক্তির প্রাধান্য। কামক্রোধ লোভাদি সংযত করিয়া, ষড়্‌বর্গকে জয় করিয়া, আসক্তির বন্ধন ছেদন করিয়া, যাঁহারা পরমেশ্বরের উপাসনায় উপবেশন করেন, তাঁহারা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে বিস্ময়কর বিভূতি প্রকাশ করিয়া, এই মর্ত্ত্যজগতে অমরত্বের আসনপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন; এবং তাঁহাদের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া অগণ্য লোক সাধনার পথে উৎসাহিত ও আকৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা এই গ্রন্থে ভক্তিমার্গের মহা পুরুষগণের জীবনী ও তীর্থ সমূহের বৃত্তান্ত বর্ণন করিব। সাধু উদ্দেশ্যে সদ্ভাব সমূহের আলোচনা জন্য এই গ্রন্থের নাম "সদ্ভাব তরঙ্গিণী।"

এই গ্রন্থে আমরা কোন সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে সংস্রব রাখিব না। পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত যত সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, সমস্তই সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া মহাপুরুষ বা অবতার পুরুষগণ কর্ত্তৃক সংঘটিত। সমস্ত সম্প্রদায়েই সেই পরমেশ্বরে নির্ভরশীল, সুনির্ম্মলচিত্ত, মহা প্রেমিক সাধক আবির্ভূত হইতে পারেন। শাক্ত, সৌর, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য এই পঞ্চসম্প্রদায় কেন, মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি উপাসক সম্প্রদায় মধ্যেও বহু বহু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থে ঋষিপ্রদর্শিত শাস্ত্রানুমোদিত পঞ্চবিধ সম্প্রদায়ের ভক্তিবাদী মহাপুরুষগণের বৃত্তান্ত যতদূর সাধ্য লিপিবদ্ধ করিব, এবং বঙ্গদেশীয় হিন্দু আচারে অন্বিত, দুই চারিটী মুসলমান সাধকের জীবনী ও প্রকাশ করিব।

আর্য্য-শাস্ত্র প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া সাধনা করিলে, সাধক কি প্রকারে অমানুষিক শক্তি লাভ করেন এই গ্রন্থে তাহা বর্ণিত হইবে। তবে এই সকল ইতিহাস আমরা যদিও অধিকাংশ স্থলে জনপ্রবাদের উপরে নির্ভর করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছি—সেই জনপ্রবাদ ও অধিকাংশ স্থলে সাধু মহাত্মগণের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি। তান্ত্রিক সাধকগণের বৃত্তান্ত দেশপূজ্য তান্ত্রিক সাধকগণের মুখে শ্রবণ করিয়াছি।

কমলাকান্তের জীবনী সংগ্রহ করিতে বর্দ্ধমানে গমন করিয়াছিলাম। সেখানে মহারাজধিরাজ শ্রীলশ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্‌ মহাতাব বাহাদুরের সাহায্যে, কমলা-

কান্তের সাধনাসন সমূহ দর্শন করিয়া, যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা ভিন্ন মহারাজা রামকৃষ্ণের ভবানীপুরবাসী হরানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের মুখে "ধর্ম্মনারায়ণের মার" বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। হরানন্দ সরস্বতীর দেহাবসান স্বচক্ষে দর্শন করিয়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম। যে মহাপুরুষ ইচ্ছানুসারে ছিন্নবসন ত্যাগের মত জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার রসনাগ্রে মিথ্যা থাকিতে পারে, তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। এইরূপ সাধককুলতিলক কামদেব তার্কিকের জলন্ত চিতারোহণ-বৃত্তান্ত রাজা সীতারামের সমসাময়িক গোঁসাই গোরাচান্দের গ্রন্থে যেমন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমন তান্ত্রিক সাধকগণের সঙ্গে কথোপকথনেও অনেক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যাঁহারা যে কর্ম্মের কর্ম্মী, তাঁহারা তাহার মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ; এবং মর্ম্মানুভব করিয়া পরমানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন। তাই যাঁহারা ভগবানে নির্ভরশীল, পরাপ্রেমে অন্বিত, স্থিরবিশ্বাসী ভাগবত, এই ভক্তিগ্রন্থ তাঁহাদের শ্রীকরকমলে সুখাধ্যায়ন জন্য অর্পণ করিলাম।

বর্ত্তমান জগতে বহু বিষয় অবলম্বন করিয়া বহুগ্রন্থ প্রণীত হইতেছে, এবং হওয়াও কর্ত্তব্য। এই সময়ে বিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষগণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইলে, তাহাও অসঙ্গত হইবে না, বলিয়া বিশ্বাস করি। অনেক নির্ভরশীল বিশ্বাসী ভক্ত বিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষগণের ইতিহাস অধ্যয়নে যেমন আগ্রহান্বিত তেমনি আনন্দিত হইয়া থাকেন। এই গ্রন্থ তাঁহাদের শ্রীকরকমলে অর্পণ করিতেছি।

ভুলুয়া—ঘোষপুর, ফরিদপুর।

সূচী।

শ্রীশ্রীসদ্ভাবতরঙ্গিণী।
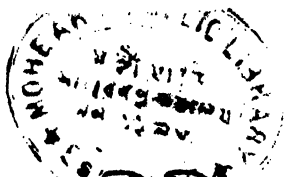
প্রথম খণ্ড।

বিভূতিযোগ।

আর্য্যালোকগৌরব ঋষিপ্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া, যাঁহারা একাগ্র অন্তরে সাধনা করেন, তাঁহাদিগের নিকটে যে সকল অমানুষিক কার্য্য সময় সময় দৃষ্টিগোচর হয়, সেই সকলকে "সাধনবিভূতি" নামে অভিহিত করা হয়। সাধারণজ্ঞানে যাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, সাধকগণ তাহা সম্ভব করাইয়া জনসাধারণের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া থাকেন। মহাপুরুষগণের বিভূতি দর্শন করিয়া, বহুলোক তাঁহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁহাদের গুণকর্ম্মসমূহ অনন্য অন্তরে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়া থাকে। সেই অধ্যয়ন ও আলোচনা এমন ভাবে ভক্তিবিহ্বল অন্তরে করিতে থাকে, যে উপসংহারে তাঁহাদিগকে অবতার-পুরুষ বা সেই পরমপুরুষ ভগবান বলিয়া ঘোষণা করে, এবং তাঁহাদিগকে মুক্তিদাতা জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের উপাসনায় নিযুক্ত হয়। বিজ্ঞান বা রসায়নের সাহায্যে নানারূপ কল কারখানা নির্ম্মাণ করিয়া, নানা বিষয়ের পণ্ডিতগণ, নানা প্রকারে সাধারণ জগতে বিস্ময়োৎপাদন করিলেও, সাধকগণের সাধন-বিভূতির নিকটে তাঁহারা হতবুদ্ধি হইয়া থাকেন।

বিজ্ঞান বা রসায়নের সাহায্যে সাধন-বিভূতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। অনলে হস্ত প্রদান করিলে হস্ত দগ্ধ হইয়া থাকে, ইহা প্রকৃতির চিরস্থির নিয়ম; কিন্তু সেই বিশ্বভস্মকারী প্রজ্জ্বলিত অনলরাশির মধ্য দিয়া, যখন কাশীধামে জঙ্গম বাবা নামক সাধককে অবিকৃত কলেবরে ভ্রমণ করিতে দেখিলাম, অথবা চিরকুট্টা বাবা নামক মহাপুরুষকে, দক্ষিণ শ্রীহট্টের সামসের নগর চাবাগানের দক্ষিণদিকবাহিনী হামুনদীর তীরে, জানুদ্বয়ের মধ্যে বাট্‌লাই রাখিয়া, পরমান্ন রন্ধন করিতে দর্শন করিলাম, তখন কেহই তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না।

জলে অনল নির্ব্বাপিত হয়, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম ; কিন্তু সাধককুলতিলক শরতচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে, যখন ঝালকসাঁই বাবাকে দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলাম, তখন এই প্রাকৃতিক নিয়মের বৈপরীত্য দর্শন করিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম। ঝালকসাঁই বাবা আজীমগঞ্জ বালুচরে গঙ্গার মধ্যে ভেলার উপরে অবস্থান করিতেন। গঙ্গার তীর হইতে তাঁহার ভেলা প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে নঙ্গরের সাহায্যে আবদ্ধ থাকিত। তীর হইতে তাঁহার নিকটে যাইবার জন্য সামান্য একটা কাঠের সাঁকো ছিল। ভেলার উপরে শীত বৃষ্টি রৌদ্র হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য কোন আচ্ছাদন ছিল না। তাঁহার ভেলা দ্বাদশবর্গ হস্তপরিমিত ছিল, এবং তিনি অগ্নিহোত্রী হিমালয়-প্রস্থী সন্ন্যাসী ছিলেন। সর্ব্বদা একটী অগ্নিকুণ্ড তাঁহার সম্মুখে থাকিত। বর্গহস্ত পরিমিত স্থানে, মাত্র দুই অঙ্গুলি উচ্চ মৃত্তিকার বেদীর উপরে সেই অগ্নি প্রজ্জলিত থাকিত। আমরা শ্রাবণ মাসে তাঁহাকে দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলাম। গলধারে বৃষ্টি পড়িয়া আমাদিগের গতি একপ্রকার রোধ করিয়াছিল। শিরোপরি ছত্র থাকা সত্ত্বেও আমাদের পরিচ্ছদ জলসিক্ত হইয়াছিল। এমন মুষলধারে বৃষ্টি পতনের মধ্যেও মহাপুরুষের ব্রতস্থিত অগ্নি ঘৃতের প্রদীপের মত জ্বলিতেছিল। আমরা হতবুদ্ধি হইয়া দর্শন করিয়াছিলাম।

জলে অনল নির্ব্বাপিত হয়, কিন্তু সেই জল, মহাপুরুষগণ অনলে নিক্ষেপ করিয়া, ঘৃতাহুতি প্রদানের মত, অনলকে প্রজ্জলিত রাখিয়া থাকেন। এই বিভূতির পরিচয় জড়বিজ্ঞান প্রদান করিতে পারে না। দর্শন ইহার সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারে না। এবং গণিত শাস্ত্র ইহার অনুপাতনির্ণয়ে সমর্থ হয় না।

মহাপুরুষগণ এই অত্যদ্ভুত বিভূতির অধিকারী কি প্রকারে হইয়া থাকেন, তাহার অন্বেষণে একটা মন্তব্যে উপস্থিত হইতে পারা যায়। এই প্রকার অলৌকিক অপ্রাকৃতিক বিভূতিপ্রকাশে একমাত্র সেই সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরই অধিকারী। তাঁহার ইচ্ছায় এই চরাচর জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-ক্রিয়া সংবাহিত হইয়া থাকে। তাঁহার ইচ্ছায় ইহার প্রাকৃতিক নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং কেবলমাত্র তাঁহারই ইচ্ছায় এই প্রাকৃতিক নিয়মের বৈপরীত্য ঘটিতে পারে। তাঁহারই সুমঙ্গল বিধানে জীবজগৎ নিত্য জনমমরণশীল চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা তাঁহারই আদেশে সমগতির নিয়মে আপন আপন

।তিপথে গমনশীল। তাঁহারই ইচ্ছায় পবনের জীবনত্ব, সলিলের শীতলত্ব এবং অনলের দাহিকাশক্তি। প্রয়োজন বোধ করিলে তাঁহার নিয়ম কেবল তিনিই পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। তাঁহার ইচ্ছায় কিছু অসম্ভব নাই, মপ্রাকৃতিক নাই, অযৌক্তিক নাই এবং অবিশ্বাসের নাই।

আগুনের সম্মুখে উপবেশন করিলে শরীর উত্তপ্ত হয়, এবং বরফখণ্ডের নিকটবর্ত্তী হইলে শরীর শীতল হয়, ইহা যেমন স্বাভাবিক, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের সাধনায় উপবেশন করিয়া, যিনি যতদূর নিকটবর্ত্তী হন, তিনি ততদূর শক্তিমান হন, ইহাও তেমনি স্বাভাবিক।

সমস্ত শক্তিই সেই এক অদ্বিতীয়া মহাশক্তির শক্তি। একা তিনি অনন্তরূপে প্রকাশিতা, অনন্তভাবে অনন্তজাতির মধ্যে আরাধিতা। সাধক তাঁহার যে কোন মূর্ত্তি, যে কোন ভাব, অবলম্বন করিয়া সাধনা আরম্ভ করিবেন, তাহাতেই তিনি শক্তিমান হইতে পারিবেন।

যে সাধক সকল শক্তির সমাহার সেই আদ্যাশক্তির সাধনায় অননামন হন, তিনি সেই আদ্যাশক্তির প্রভাবের নিকটবর্ত্তী হইয়া যে মহাপ্রভাবে অন্বিত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি! তাই ভক্তিগ্রন্থ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত উৎসাহবাক্যে প্রচার করিতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও শক্তিসমূহ কৃষ্ণগতপ্রাণ বৈষ্ণবের শরীরে বিরাজ করে।"

ভক্তিশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়নে জানিতে পারা যায়, "সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বরের ইচ্ছায় চরাচর জগৎ পরিচালিত হয়, কিন্তু তিনি তাঁহার একান্ত প্রিয় ভক্তের ইচ্ছায় পরিচালিত হন। ভক্তের প্রয়োজনসাধনে তিনি ছায়ার মত ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন।" "ভক্তের ভগবান" এই মহাবাক্য ধর্ম্ম জগতের কোন সম্প্রদায়ই অস্বীকার করেন না।

অতএব ভক্তজগতের সাধকগণমধ্যে যখন অসম্ভব সম্ভব হইতে দর্শন করি, যুক্তিসিদ্ধান্তের অতীত বিভূতি দর্শন করি, তখন বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। ভক্তের জন্য তিনি প্রহ্লাদের নিকটে আসিয়া অনলে শীতলতা সম্পাদন করেন, এবং তীব্র হলাহলকে অমৃতে পরিণত করিয়া থাকেন। আর জড়ভরতের আততায়িগণকে বিনাশের সময়, তিনি প্রতিমা হইতে প্রলয়ের ধূম্ররূপে বহির্গত হইয়া, দশদিক আচ্ছন্ন করিয়া থাকেন।

তিনি যীশুর জগতে কখনো একখানা রুটীর সাহায্যে সহস্র সহস্র লোকের ক্ষুধার শান্তি করিয়া প্রিয় সন্তানের গৌরব বৃদ্ধি করেন, কখনো

কৃষ্ণগতপ্রাণা পাণ্ডবরমণীর পাকস্থালীতে একটী অন্নে সহস্রশিষ্যসঙ্গী দুর্ব্বাসা মুনির দর্প চূর্ণ করিয়া শরণাগতের মহিমা বিস্তার করেন। তিনিই মহিমার হস্ত বিস্তৃত করিয়া, মানাম মন্ত্রের মহাসাধক, রামপ্রসাদের গাবের গাছে, অকালে আম ধরাইয়া অতিথির প্রার্থনা পূর্ণ করেন, এবং বর্দ্ধমান গগনের গৌরবের সুধাকর কমলাকান্তের মদের ঘটী দুগ্ধে পূর্ণ করিয়া, মহারাজধীরাজ তেজচন্দ বাহাদুরের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া থাকেন।

মহাপুরুষগণের সাধন-বিভূতি প্রকাশিত হইলে মোহান্ধ মনুষ্য সমাজের অশেষরূপে মঙ্গল সাধিত হয়। তাঁহাদের বিভূতি দর্শন করিয়া দুর্জ্জন অবিশ্বাসিদিগের হৃদয়ে আস্তিক্য বুদ্ধির সঞ্চার হয়। দুর্জ্জনগণ কুপথ পরিত্যাগ করিয়া সুপথে গমন করে। ধৃষ্টের দল দম্ভ দর্প পরিত্যাগ করিয়া বিনয় অবলম্বন করে। ঘোর বিষয়াসক্ত বিষয়নিবদ্ধ ব্যক্তি দৃষ্টি উত্তোলন করিয়া পরলোকের দিকে তাহা সঞ্চালন করিতে অবসর প্রাপ্ত হয়। আসুরিক ভাবে উন্মত্ত প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে পশ্চাৎপদ হয়। সুতরাং বিভূতির শক্তি, বিভূতির উপকারিতা, কাহারো অস্বীকার করিবার অধিকার নাই।

বিভূতির সাহায্যে অবতার পুরুষগণেরও অবতারত্ব প্রতিপাদিত হয়। যে সকল মানুষে লোকাতীত শক্তি দৃষ্টিগোচর হয়, তাঁহাদিগকেই অবতার বলে। অবতীর্ণ হইবামাত্রই পৃথিবী তাঁহাদিগকে অবতার বলিয়া স্বীকার করে না। তাঁহাদের অমানুষিক বিভূতিসকল দর্শন করিয়া মনুষ্যসমাজ যখন বিস্ময়াবিষ্ট হয়, তাঁহাদের লোকহিতকর কর্ম্মসমূহ যখন লোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে আরম্ভ করে, তখনই তাঁহারা অবতার বলিয়া গৃহীত হন।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরণস্পর্শে যখন কাঠের তরণী কাঞ্চনে পরিণত হইয়াছিল, যখন পাষাণ মানবী হইয়াছিল, যখন সেতুবন্ধনের সময়ে সমুদ্রসলিলে পাষাণ ভাসমান হইয়াছিল, যখন বনের বানর, বনের ভালুক, আর আকাশের বিহঙ্গম, তাঁহার হিতসাধনে একত্রে পরিশ্রম করিয়াছিল, এবং যখন অধর্ম্মের ধ্বংস ও ধর্ম্মের সংস্থাপন সাধিত হইয়াছিল, দেশ তখনই তাঁহাকে পরব্রহ্মের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল।

এইরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। তিনি সেই আরাধিত পরমপুরুষ কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়াছিলেন, গোপলোক ধ্বংস করিতে শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত আরম্ভ করিয়াছিলেন,

কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে ছত্র করিয়া ব্রজমণ্ডলকে রক্ষা করিতে লাগিলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র বিস্ময়বিমোহিত চিত্তে, তাঁহার শ্রীচরণ কমলে শিরলুণ্ঠন করিয়া, সুরলোকে গমন করিয়াছিলেন।

ইন্দ্রের ন্যায় প্রজাপতি ব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি গোপাল ও গোপবালকগণকে অপহরণ করিতে লাগিলেন এবং অপহরণ করিয়া ব্রহ্মলোকে অপসারিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপন বিভূতিবলে তৎসমস্তকে যথাস্থানে স্থাপন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা যতবার অপসারিত করেন, ততবারই নূতন নূতন গোপাল ও গোপবালক উৎপন্ন হয়। তখন বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতির বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি চতুর্ম্মুকুটে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণরজ স্পর্শ করিয়া বিনয়বচনে ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন।

এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবও ব্রহ্ম হরিদাস প্রভৃতি ভাগবতগণকে নিজ নিজ অভীষ্ট মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া বৈষ্ণবমণ্ডলের অন্তর অধিকার করিয়াছিলেন। কেবল ভারতবর্ষ নহে পাশ্চাত্য জগতেও প্রভু যীশুখৃষ্ট বিভূতি দ্বারা পরিত্রাণকর্ত্তার আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জীবজগৎ মায়ামোহ ও অজ্ঞানতার অধীন, আত্মসুখের নিমিত্ত উন্মত্ত ; এবং আত্মসম্বরণে অসমর্থ। এই চঞ্চল জগতকে সত্যের পথে চালিত করিতে হইলে স্তম্ভিত করিবার প্রয়োজন হয় ; বিভূতিযোগ তাহার প্রধান সহায়।

যিনি যে মার্গের সাধকই হউন না কেন, যদি প্রণালীপূর্ব্বক সাধনমার্গে চলিতে আরম্ভ করেন, কিছুদিন পরে সাধনাই তাঁহাকে বিভূতি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। যাঁহারা যোগমার্গে বিচরণশীল, তাঁহারা যোগের অত্যদ্ভুত ক্ষমতাদ্বারা অসম্ভব সম্ভব করাইয়া থাকেন। পঞ্জাবের রণজিৎসিংহের সভাশোভনকারী হরিদাস সাধু তাহার একটী প্রধান দৃষ্টান্ত। শরীরবিজ্ঞান কোটী কোটী জীবনের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া যে সত্য নির্ণয় করিয়াছে, এবং প্রাকৃতিক জগতে যে সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তনের কোন সম্ভাবনা নাই—হরিদাস সাধুর নিকটে তাহা মিথ্যা হইয়া গিয়াছে।

এক ঘণ্টা যদি মানুষের নিশ্বাস প্রশ্বাস রোধ করা যায়, তাহা হইলে কিছুতেই তাহাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারা যায় না, ইহা শরীরবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। কিন্তু হরিদাস সাধু যোগবলে, নয়মাস নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া রোধ করিয়া, আহার নিদ্রা মলমূত্রত্যাগ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া,

মৃত্তিকার তলে অবস্থান করিয়াছিলেন। লক্ষ লক্ষ লোকে তাহা দর্শন করিয়াছিল। এই প্রকারে জ্ঞানমার্গে, প্রণালীপূর্ব্বক বিচরণশীল সাধক, জ্ঞানের বিভূতি দর্শন করাইয়া জনসমাজকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া থাকেন।

জ্ঞানী সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করেন—তাঁহার শত্রু নাই, মিত্র নাই। তাঁহার মানাপমান ক্ষুধাতৃষ্ণাও ব্রহ্ম পদার্থ। তিনি যে কোন স্থানে যে কোন ভাবেই অবস্থান করুন না কেন সর্ব্বদা ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। তিনি কাহারও হিংসা করেন না; তাই কেহ তাঁহারও হিংসা করে না। তিনি ভয়ঙ্কর হিংস্রস্বভাব ব্যাঘ্রভল্লুকপরিপূর্ণ জঙ্গলের মধ্যে বাস করেন; কিন্তু তাহারা তাঁহাকে হিংসা করে না। তাই হান্নুনদীতীরে কুত্তাশা ফকীর নামক মহাপুরুষের পার্শ্বে ভয়ঙ্করা বাঘিনীকে শাবকগুলির সঙ্গে শায়িতা দর্শন করিয়াছিলাম। সন্ন্যাসীলোকগৌরব শিবানন্দ ব্রহ্মচারী যখন ব্রাহ্মণী নদীতীরস্থ পরাশর আশ্রমে বসিয়া, বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে ভজন করিতেছিলেন, তখন কালের মূর্ত্তি কালকূটে পরিপূর্ণ, দুই বিষধর সর্পকে তাঁহার দুই পার্শ্বে ফণা বিস্তার করিয়া, শির দোলাইতে দেখিয়াছিলাম।

কর্ম্ম-যোগের প্রচারকর্ত্তা ও প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব কর্ম্মযোগীর সর্ব্বপ্রধান বিভূতি। যাঁহারা কর্ম্মযোগী, তাঁহারাই প্রত্যক্ষ বীর সাধক। তাঁহারা কর্ম্মবলে, সুকৌশলে, কর্ম্মফল খণ্ডন করিয়া, আনন্দলোকের অধিকারী হইয়া থাকেন।

তার পরে ভক্তিযোগের বিভূতি। ভক্ত ভগবানের শ্রীচরণকমলে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া, লাভালাভ জয় পরাজয় সুখ দুঃখ, সমস্ত বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া, অবস্থান করেন। তাঁহার সাধনায় যে সকল বিভূতি দৃষ্টিগোচর হয়, সে সকলের কর্ত্তা স্বয়ং ভগবান। ভক্তগণ ভগবচ্চরণে অনন্যমন হইয়া, যখন যাহা ইচ্ছা করেন, সর্ব্বশক্তিমান, পরমভক্তবৎসল, পরমেশ্বর তাহা আপন হাতে প্রদান করেন।

সাধকগণের বিভূতির সহিত ভেল্কীর কোন সম্বন্ধ নাই। কোন কোন স্থানে সাধন-বিভূতির সহিত ভেল্কীর সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু মূলে উভয়ের মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত্যের পার্থক্য আছে। নদীয়ার অন্তর্গত ঘূর্ণীর কুম্ভকারেরা মাটীদ্বারা ফজলী আম প্রস্তুত করিয়া থাকে। তাহা বাহ্যতঃ ফজলী আমের মত হইলেও ভোজন সময়ে রসনার তৃপ্তি সাধন করিতে সমর্থ হয় না। তাহা কেবল দেখিবার জন্য গঠিত হয়, এবং বিমুগ্ধ হইয়া দেখিতেই হয়। চিত্রিত কমলে গন্ধ নাই, মধু নাই। চিত্রিত কোকিল ললিত নিঃস্বনে বসন্তসমাগম প্রচার করিতে পারে না।

"আত্মারাম সরকারের" বাজীকরেরা শূন্য কৌটা হইতে রাশি রাশি টাকা মোহর বাহির করিয়া থাকে; কিন্তু সেই সকল দ্বারা তাহাদের অর্থাভাব দূরীকৃত হয় না। যাহারা রাশি রাশি টাকা মোহর বাহির করিতে পারে, তাহারা তিন চারি ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া, মাত্র একটী টাকা প্রাপ্ত হইলে, পরমানন্দে চলিয়া যায়। সেইরূপ যাহারা লোকদৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত সাধুর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, ভেল্কী দেখাইয়া ভ্রমণ করে, তাহারা তাহাদের নিজের অভাব পূর্ণ করিতে পারে না, আপনার অন্তরে সাধনানন্দ উপলব্ধি করিতে পারে না; সরলহৃদয় অজ্ঞলোকের বিস্ময়োৎপাদন করে বটে, কিন্তু সাধনা দেবীর সন্তানগণের সীমান্তে যাইতেও শঙ্কায় স্খলিতকচ্ছ হইয়া পলায়ন করে।

তুচ্ছ অর্থ ও প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ক্ষুদ্র লোকে ভেল্কী শিক্ষা করে। আর "জগৎ মিথ্যা" জ্ঞান করিয়া, সর্ব্বপ্রকার ভোগ সুখে বিরত হইয়া, ত্যাগের সাধনায় মনস্বিগণ সাধন-বিভূতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা যোগমার্গে ভ্রমণশীল, তাঁহাদের বিভূতির সঙ্গেও ভক্তিমার্গের সাধকগণের বিভূতির কোন সম্বন্ধ নাই। তবে যোগমার্গের বিভূতি সাধনা-সম্ভূত; সুতরাং তাহাতে সত্য আছে। তাহা ভেল্কীর মত মিথ্যা নহে। বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত সাধন পথই ভণ্ড দ্বারা সমাছন্ন হইয়াছে, এবং সমস্ত পথেই একলক্ষ্যে গমনশীল সাধক সুদুর্লভ হইয়াছেন। যোগমার্গেও সাধকের সংখ্যা অত্যল্প; তবে অনিমালঘিমার সাধক ক্বচিৎ দুই একজন দৃষ্টিগোচর হন।

যোগীর বিভূতি দর্শনে অনেক লোক যোগাভ্যাসে নিযুক্ত হয়। চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিতে হইলে যোগ তাহার প্রধান সহায়।

যোগানন্দ স্বরস্বতী (দেবীদাস তেওয়ারী) ওঙ্কারনাথ মণ্ডলীর একজন শিষ্য ছিলেন। ভারতবর্ষের বহু স্থানে ধর্ম্মপ্রাণ লোক সমাজে তিনি সুপরিচিত। আমি উত্তরপূর্ব্ব তীর্থমণ্ডল ভ্রমণসময়ে তাঁহাদের সঙ্গে তেরমাস ছিলাম। উত্তর গৌহাটীর কমলাকান্ত দেব বহাদুরের ভবনে একদিন তিনি আপনার যোগৈশ্বর্য্য দর্শন করাইয়া বহু সংখ্যক দর্শককে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন।

ভ্রমণ সময়ে মধ্যে মধ্যে তিনি যোগবলে আমাদিগকে লুচী সন্দেশ প্রদান করিতেন, আমরা তাহা আহার করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিতাম। ফুৎকারে কাষ্ঠে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতেন, আমরা সেই অগ্নিতে শীত নিবারণ করিতাম।

একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "তিন দিন পরে বেলা দেড় ঘটিকার সময় তোমার জ্বর আসিবে।" সে জ্বর আমার সত্যই আসিয়াছিল। হবিগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব উকীল শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দেব বাক্সের মধ্যে একখানা পত্র রাখিয়া বাক্স অন্য বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন, বাক্সের চাবি আপনার হাতে রাখিলেন। কিছুক্ষণ পরে সেই পত্র যোগানন্দ আপনার আসনের নিম্ন হইতে তুলিয়া নবীন বাবুকে প্রদান করিলেন। তখন বাক্স আনিয়া খুলিয়া দেখা হইল; তাহার মধ্যে সে পত্র নাই। আমরা ভুবননাথ তীর্থ দর্শন করিবার সময় পর্ব্বতের মধ্যে ভয়ঙ্কর পিপাসার্থ হইয়া তাঁহারই যোগৈশ্বর্য্যে ডাবের জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছিলাম। এই শ্রেণীর একজন সাধক বর্দ্ধমানে আছেন। তিনি একদিন বর্দ্ধমানের "একশত আট শিবের" মন্দিরে তাঁহার শিষ্যবর্গকে বৈদ্যনাথের সন্দেশ খাওয়াইয়াছিলেন। অনেককে ভেরাণ্ডাগাছ হইতে আঙ্গুর পাড়াইয়া খাওয়াইয়া থাকেন; আমার সাক্ষাতে একটু "তাম্বুলবিহার" লইয়া স্ফটিকে পরিণত করিয়াছিলেন। বহু লোক তাঁহার বিভূতি দর্শন করিয়া, বিমুগ্ধ হইয়া, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নাম ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, অন্য নাম বিশুদ্ধানন্দ।

এই সকল বিস্ময়কর কার্য্য বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এবং বহুজনের নিকটে প্রশংসিত হইলেও, ভক্তির জগতে ভাগবত জনের নিকটে, ইহার সম্মান বা গুরুত্ব নাই। এই জাতীয় বিভূতির প্রতি ভক্তগণ উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। যাঁহারা পরমপুরুষ পরমেশ্বরের মহিমাময় চরাচরদর্শনে নিযুক্ত, যাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাণ্ডত্ব অনুভব করিয়া বিস্ময়ে আত্মহারা, যাঁহারা মানব জীবনের ক্ষুদ্রত্ব ও অস্থিরত্ব বিচারে উদাসীন ভাবাপন্ন, যাঁহারা আপনার পরাধীনত্ব ও ভগবানের কর্ত্তৃত্ব বিচার করিয়া প্রজল্প প্রয়াসে বীতরাগ, তাঁহারা লোকভুলান বিভূতিসমূহকে উপেক্ষার চক্ষে দর্শন করিবেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে।

ভক্তগণ জগতের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া, ত্রিতাপের কলহে পৃথক থাকিয়া, কেবলমাত্র শ্রীভগবানের গুণানুকীর্ত্তন ও স্মরণ মননকেই জীবনের মহাব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহারা লোকপ্রতিষ্ঠাকে কাকবিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া দীনের মত অবস্থান করিতে ভাল বাসেন। তাঁহাদের লক্ষ্য ইহকাল পরকাল ব্যাপিয়া সুদীর্ঘ এবং তাঁহাদের সাধনা ও সিদ্ধি অবিরাম শান্তি প্রবাহে আবরিত। ভক্তির পথে চঞ্চলতা নাই, গণ্ডগোল নাই, এবং ভ্রমের বা সন্দেহেরও কিছু নাই।

ভক্তির জগতে ও বিভূতি আছে, সে বিভূতি অন্য প্রকারের। তাহা লোকসংগ্রহের নিমিত্ত নহে, আপন কৃতিত্ব দেখাইবার জন্যও নহে। তাহা কোনরূপ বিশিষ্টত্বলাভের জন্যও নহে। অধিক কি, সেই বিভূতির কর্ত্তা সেই ভক্তি পথের সাধকও নহেন। ভক্তের অজ্ঞাতসারে তাহা ঘটিয়া থাকে। ভগবানের শ্রীচরণকমলে সর্ব্বস্ব নির্ভরকারী ভক্ত বালকস্বভাব। সন্তানের প্রয়োজন যেমন পিতামাতা প্রার্থনার পূর্ব্বে সাধন করেন, ভগবানও সেইরূপ ভক্তের প্রয়োজন সাধন করেন। অগ্রে সন্তানের ভোজন শয়নের ব্যবস্থা না করিয়া, পিতামাতা যেমন ভোজন শয়নে গমন করেন না, ভগবানও সেইরূপ, একান্ত শরণাগত ভক্তের ভোজন না হইলে, কোনও নৈবেদ্য গ্রহণ করেন না। ভগবান ভক্তের প্রয়োজন সাধন করেন। সুতরাং ভক্তি রাজ্যের বিভূতি ইচ্ছামত দর্শন করিতে পারা যায় না। ভগবান কি ভাবে কখন কাহাকে কেমন রাখিবেন, কখন কাহার কিরূপ ভাগ্যবিপর্য্যয় সংঘটিত হইবে, তাহা ভক্তগণ বলিতে পারেন না। তাঁহারা কেবল ভগবানকে নির্ভর করিতে জানেন—আর সম্পদে বিপদে তাঁহারই মঙ্গলময় বিধান চিন্তা করিয়া অনুদ্বিগ্ন থাকিতে জানেন—এবং সুখে দুঃখে সর্ব্বাবস্থায় অশ্রুপাত করিয়া কেবল তাহার স্মরণ মনন করিতে অভ্যাস করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন "গোপালের মা, বেগুণ দিয়া রুই মাছের ঝোল খাইতে আমার ইচ্ছা করে।" গোপালের মা বলিয়াছিলেন "তোমার ত ইচ্ছা করে, কিন্তু আমি এখন রুইমাছ কোথায় পাই।" বালক-স্বভাব ঠাকুর বলিলেন "তাইত, তবে আর কিরূপে খাই।")

ঠাকুরের বাসনা এই খানেই শেষ হইল। মনের বাসনা পূর্ণ করিতে কোন চেষ্টা নাই, কোন দৃঢ়তা নাই। মনের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে নিজের কোন ক্ষমতা আছে এমন ধারণাও নাই। রুই মাছ খাইতে ইচ্ছা হইল, মনের ইচ্ছা বলিয়া ফেলিলেন; কিন্তু যখন শুনিলেন মাছ মিলিবার নহে, তখন সে ইচ্ছা ভুলিয়া গেলেন। মাতৃভাবে তন্ময় সাধক অপার স্নেহময়ী জগজ্জননীর গুণকথা-কীর্ত্তনে নিযুক্ত হইলেন।

যিনি সেই মহিমাময়ী জগদ্ধাত্রীর শ্রীচরণকমলে আপনার সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া কেবল তাঁহারই ভাবনায় নিযুক্ত, সেই জগদ্ধাত্রী তাঁহার সকল ভাবনা ভাবিয়া থাকেন। এক ঘণ্টা যাইতে না যাইতে, ভবানীপুর হইতে কোন এক বড়মানুষ প্রকাণ্ড এক রোহিৎ মৎস্য লইয়া, দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন।

তখন গোপালের মা এবং অন্যান্য সকলের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সকলে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে সেই রোহিত মৎস্য দেখিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব বালকের মত আনন্দে আটখানা হইলেন। বাঞ্ছাকল্পতরু সাধকের বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। ভক্তজগতের বিভূতি এইরূপ। "ভক্তের বোঝা ভগবান বহন করেন," ইহা তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয়।*

---

* এই স্থানে ভুলুয়াবাবার নিজের ঘটনাটী শ্রবণ করিলে পাঠকগণ অধিকতর চমৎকৃত হইবেন। " ১৩১৯ সালে কার্ত্তিক মাসে তিনি নৌকাযোগে ফরিদপুর রেল ষ্টেশন হইতে, জন্মস্থান ঘোষপুরে জগদ্ধাত্রী পূজা করিতে যাইতে ছিলেন। তিনি তাহার পূর্ব্বে রক্তামাশয়ে তিন মাস শয্যাগত ছিলেন। তখনও তাঁহার উত্থানশক্তি ছিল না। মাত্র দশ বার দিন পূর্ব্বে অন্ন পথ্য করিয়াছিলেন। মাছের ঝোল ও ভাত ভিন্ন অন্য কিছু পথ্য করিতে ডাক্তারেরা বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহার সঙ্গে আমি, ঘাটশীলা গোপালপুরের জমীদার বাবু ভুজঙ্গ ভূষণ সিংহ, হাবড়া শালকীয়ার বাবু নরেন্দ্রনাথ বসু, পাবনা শাফল্লার বাবু বিপিন চন্দ্র ঘোষ, প্রভৃতি অনেকে ছিলাম। সাধকের পথ্য মাছের ঝোল ও ভাত। ফরিদ পুরের বাজার ভাঙ্গিলে আমরা ফরিদপুরে পৌছিয়াছিলাম। মাছের জন্য ৮।১০ জন লোকে চারিদিকে ছুটোছুটী করিলাম। প্রায় চারি ঘণ্টা কাল অন্বেষণ করিয়াও মাছ মিলাইতে পারিলাম না। যত ভেঁশাল আছে, যত জেলে নিকারীর আড্ডা আছে, সব খুঁজিলাম কিন্তু মাছ মিলিল না। সাধকের আহারের ভাবনায়, অথবা রোগীর পথ্যের ভাবনায়, সকলেই বিশেষ উদ্বেগে থাকিলাম। ফরিদপুর রেল ষ্টেশন হইতে বেলা প্রায় দেড়টার সময় আমরা নৌকায় উঠিয়া চলিতে লাগিলাম। মনকে বুঝাইবার জন্য ভুলুয়া বাবার রচিত একটী গান গাইতে লাগিলাম—

> "মন করনা ছুটোছুটি।
> যোগে ভাগ্যে যাহা আছে, আপনি তাহা যাবে জুটি॥
> কর্ম্মরজ্জু বদ্ধ তুমি মন, শ্যামা, মার হাতে বন্ধনের গুঁটী।
> সে যখন বসায় তখন বসি, যখন উঠায় তখন উঠি॥
> সে যেমন বলায় তেমন বলি, যেমন হাঁটায় তেমন হাঁটি।
> খাব খাব বল্লে কি হয়, তারই হাতে সরাকাঠী॥
> সে না দিলে যায়না পাওয়া, মিথ্যা আশায় হলে মাটী।
> ঐ যে, কেউ মারে কেউ রক্ষা করে, তাও তার ইচ্ছা যেন খাটী॥
> কাহার সাধ্য আছে ভবে, তাহার বিধান যায় উলটী।
> এখন, ছুটোছুটী ত্যাগ করি মন, ধর মায়ের চরণ দুটী॥
> কতই ধরলে কতই ছাড়লে, তাই পেলে সে দিল যেটী।
> ভুলুয়ার ভুল আগাগোড়া, বুঝ্‌লনা সার মোটামুটী॥"

যাহা হউক নৌকা যখন বড় পদ্মায় পড়িবে, তখন বিপিনবাবু দেখিলেন, প্রায় দশসের ওজনে একটা আড় মাছ, সহসা জল হইতে লাফ মারিয়া উপরে উঠিল। বিপিনবাবু তখনই নামিয়া মাছ ধরিয়া নৌকায় তুলিলেন। আমাদের কাহারো মুখে আর কথা ফুটিল না। রাত্রে সেই মাছ আমরা প্রায় পঁচিশজনে আহার করিলাম।

পরমহংসদেবের জন্য সন্তানগরবে গরবিনী বড় মানুষের ঘাড় ধরাইয়া মাছ পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু আজ পদ্মাগর্ভে পীড়িত সন্তানের পথ্যের জন্য, অলক্ষিতে স্নেহের হস্ত বিস্তার করিয়া আপনি মৎস্য ধরিয়া তীরে নিক্ষেপ করিলেন। দশভুজধারিণী দশভুজে সন্তানের বোঝা বহন

১২৮২ সালে বৈশাখ মাসে মা ভাবে তন্ময় শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়, নদীয়ার কুমারখালী গ্রামে, আপনার নির্জ্জন ভবনে, মা নাম মন্ত্র বুকে ধরিয়া, জগজ্জননীর পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া, নিশ্চেষ্ট হইয়া উপবেশন করিলেন। ক্রমে সর্ব্বপ্রকার অভাবের তরঙ্গ উত্থিত হইল, অন্নবসনেরও সংস্থান রহিল না। বিদ্যার্ণব মহাশয়ের কন্যা কালি তখন কোলের মেয়ে। কালির দুধের পয়সাটীও আর মিলিল না। কিন্তু নির্ভরশীল সাধক তবুও সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিলেন না। কত ভক্ত তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন, কাহারো নিকটে আপন অভাবের কথা প্রকাশ করিতেন না। সস্ত্রীক ক্রমে দুই রাত্রি উপবাসে অতিবাহিত করিলেন। লক্ষ্মীরূপিণী পত্নী, ওষ্ঠাগতপ্রাণা বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া, স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন। পত্নীর কোলে দুধের সন্তান অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে, সাধক সেদিকে ভুলিয়াও দৃষ্টিপাত করিলেন না। জয় মা সর্ব্বমঙ্গলে বলিয়া এক একবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। আর বিদ্যার্ণব মহাশয়ের ধর্ম্মের সঙ্গিনী,এবং আমাদের গৌরবের জননী, ক্রোড়স্থা বালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, নীরবে, বিষণ্ণমুখে বসিয়া রহিলেন।

বেলা প্রায় এগারটা বাজিয়া গেল। ষ্টেশনমাষ্টার চন্দ্রকান্ত বাবু ও শশধর বাবু পোষ্টমাষ্টার তখন একখানি টেলিগ্রাম লইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং প্রণাম করিয়া মাকে বলিলেন "মা গোরক্ষপুর হইতে এক ভক্ত একশত টাকা প্রণামী পাঠাইয়াছেন।"

বীরসাধক তখন নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া, সর্ব্বমঙ্গলার শ্রীচরণকমলের মকরন্দ পানে বিভোর ছিলেন। ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা, অভাবের কথা, স্ত্রীপুত্রের কথা, তখন তাঁহার মনে ছিল না। তখন সংবাদ শুনিয়া আমাদের জননী, মা সর্ব্বমঙ্গলার সর্ব্বমঙ্গলকর বিধানে রোমাঞ্চিতা হইলেন, এবং পুলকের অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বীরসাধক নয়ন উন্মীলন করিলেন। চন্দ্রকান্ত বাবু টেলিগ্রাম পড়িয়া শুনাইলেন "আপনি উপবাস করিবেন না। একশত টাকা পাঠাই। পত্র যাইতেছে।" ভক্ত।

করেন, পদ্মাগর্ভে আজ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সকলে স্বচক্ষে দর্শন করিলাম। ভক্ত জগতের বিভূতি অনুভবে যেমন অমৃতময়, দর্শনেও তেমনি উল্লাসজনক। প্রয়োজন হইলে ভক্তের জন্য মাছ জল ছাড়িয়া ডাঙ্গায় উঠে, ইহাপেক্ষা বিস্ময়কর বিভূতি আর কি আছে।

শ্রীহেমন্তকুমার চৌধুরী। খানখানাপুর।

পরে পত্র আসিল। তাহাতে লেখা ছিল, "আমি রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, যেন জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী, অনুপম কান্তিতে দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া, আমার মণ্ডপে আসিয়া উপবেশন করিলেন, এবং অভয়ের হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি কুমারখালি শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবকে একশত টাকা পাঠাও। সে দুই দিন অনাহারে আছে।"

দেব, প্রাতে শরৎ বাবুর নিকটে আপনার পরিচয় অনুসন্ধান করিয় সমস্ত অবগত হইলাম। এই মাসের শেষ পর্য্যন্ত আমি আপনার শ্রীচরণ দর্শনে গমন করিব। করুণাময়ী মায়ের আদেশে আমি আমাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছি। যৎকিঞ্চিত যাহা পাঠাইয়াছি গ্রহণ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।"

এই ঘটনার পরে শ্রীযুক্ত বিদ্যার্ণব মহাশয়কে আর উপবাসে কষ্ট পাইতে হয় নাই। সহস্র লোকের দৃষ্টি তাঁহার উপরে পতিত হইয়াছিল। ভক্তের প্রতি ভগবানের এইরূপ কৃপা ভক্ত জগতে চিরকাল দর্শনীয়। যাঁহারা ভক্তি পথের পথিক, তাঁহারা ভগবানের এই প্রকার করুণার দৃষ্টান্ত শ্রবণে, আনন্দাশ্রু পাত করিয়া থাকেন। ভক্তজগতে ভবানের করুণার বার্ত্তা শ্রবণ কীর্ত্তনই প্রধান সাধনা।

কিন্তু যাহারা ভগবদ্বিমুখ বিষয়ান্ধ, যাহারা নিজ নিজ কর্ত্তৃত্বের প্রতি নির্ভরশীল, তাহারা ভগবানের করুণার সংবাদ শ্রবণ করিয়া অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করে। অবিশ্বাসে যাঁহাদের দিব্য চক্ষু অন্ধ, সন্দেহের তরঙ্গে যাহাদের হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন, ভাগবত কর্ম্মকে যাহারা অলস ও অকর্ম্মার ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে, ভগবন্মহিমা ও ভক্তের বিভূতি তাহাদের অন্তরে আনন্দ সঞ্চারে সমর্থ হয় না। নাস্তিক ব্যক্তি পরমেশ্বরের অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়া থাকে। পরমেশ্বর বা তাঁহার ভক্তজনের গুণগান নাস্তিকের জন্য নহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন, যাহারা ভক্তিহীন, যাহারা সেবাবাদী, যাহারা শুশ্রূষারত নহে, পরমজ্ঞানগর্ভ, পরম মঙ্গলকর শ্রীশ্রীভগবদ্গীতা তাহাদিগকে শ্রবণ করাইবে না।

কমলাকান্ত।

যিনি বিশ্বজননী বিশালাক্ষীর শ্রীচরণকমলে মনপ্রাণ অর্পণ করিয়া, চান্নার মহিমাময় সাধনাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, এবং অনন্যভক্তিবলে পরমানন্দের অধিকারী হইয়া ত্রিতাপের হস্তে নিষ্কৃতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যিনি জগতের নশ্বরত্ব সম্যকপ্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিয়া জাগতিক ভোগাকাঙ্ক্ষার মস্তকে পদাঘাতপূর্ব্বক স্থিতধীর আসনে সমাসীন হইয়াছিলেন, যিনি শক্তিতত্ত্বে অধীয়ান হইয়া ভেদ বুদ্ধি ছেদন করিয়াছিলেন, যাঁহার সুমধুর কোকিলকণ্ঠে ললিত নিঃস্বনে ভগবদ্বিষয়ক কোমল কবিত্বের অমৃতপ্রবাহ বহির্গত হইয়া বঙ্গদেশ-বাসীর সাধনা ও সাহিত্যজগতের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিল, এবং মহাপ্রস্থান সময়ে যিনি সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষোচিত ইচ্ছামৃত্যু অবলম্বন করিয়া, আপনার বাঞ্ছিত লোকে গমন করিয়াছিলেন, সেই কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় ছিলেন, এবং বর্দ্ধমানের অন্তর্গত চান্নাগ্রামের মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের দৌহিত্র ছিলেন।

বগুড়ার অন্তর্গত, মহারাজা রামকৃষ্ণের সাধনক্ষেত্র ভবানীপুরে, যে সাধক-লোক বিখ্যাত বীরাগ্রগণ্য তান্ত্রিক সাধক হরানন্দ সরস্বতী ছিলেন, তিনি এবং শতবর্ষী বৃদ্ধ সাধক খাঁকী বাবা বলিয়াছিলেন, "সাধক কবি কমলাকান্তের পিতার নাম মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও মাতার নাম মহামায়া। কমলাকান্ত অম্বিকা কালনায় জন্মগ্রহন করিয়াছিলেন এবং শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় চান্নায় মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য অম্বিকা কালনার অধিবাসী ছিলেন। এবং অভ্যাগত সাধুসজ্জনগণের সঙ্গপ্রিয় ও সেবাপরায়ণ ছিলেন। বিষয়বিরাগী ভাগবত আচারে সর্ব্বদা অম্বিত থাকায় তিনি অতিশয় দরিদ্র ছিলেন।"

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত থানা জংসনের মাত্র দেড় ক্রোশ উত্তরে চান্নাগ্রাম। চান্নার উত্তর পার্শ্ব দিয়া, একটী সুনির্ম্মল স্বচ্ছ সলিলধারা খড়িয়া নাম গ্রহণ করিয়া, মৃদুমন্দ প্রবাহে প্রবাহিতা। সাধককুলতিলক কমলাকান্ত যে বিশ্ব জননী বিশালাক্ষীর মন্দিরে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভে চরিতার্থ হইয়াছিলেন, সেই বিশালাক্ষীর পবিত্র মন্দির এই খড়ীয়া তীরে চান্নাগ্রামের উত্তর পার্শ্বে

আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান মহারাজধীরাজ, পরম ভাগবত, ধর্ম্মকর্ম্মোৎসাহী, বিজয়চন্দ মহাতাব বাহাদুর এই মন্দিরের সংস্কার করিয়া জগজ্জননীর নিত্য নৈমিত্তিক অর্চ্চনার ভার রাজভাণ্ডার হইতে বহন করিতেছেন।

যে স্থানে, মহাপুরুষ কমলাকান্ত বাল্যকাল হইতে প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া, জীবনের বহু কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, যে সকল গুণ কর্ম্মবলে তিনি ভক্ত ও পণ্ডিত সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়াছিলেন, যে স্থান তাঁহার সেই সকল গুণকর্ম্মের সাধনক্ষেত্র, সেই চান্নাগ্রামের তৎসাময়িক অবস্থা বর্ণন এই স্থানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কমলাকান্তের সময়ে এই চান্নাগ্রামে চারিশত পঞ্চাশঘর ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। সংস্কৃত শাস্ত্রাদি শিক্ষার নিমিত্ত ষোড়শসংখ্যক চতুষ্পাঠী ছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ এই স্থানকে আপন আপন প্রতিভাবলে উজ্জ্বলীকৃত করিয়া, এক সময়ে সমগ্র আর্য্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। সাধক-কুলতিলক কমলাকান্তও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন, এবং এক সময়ে তাঁহার চতুষ্পাঠী পারদর্শিতায় সকলের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থ সমূহের অধিকাংশই সাধনাসম্বন্ধীয়। যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, তাঁহার গৃহে কমলাকান্তের স্বহস্তলিখিত "সাধন পঞ্চক" নামে গ্রন্থ ছিল; তাহা কিছুদিন পূর্ব্বে রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়, তাঁহার কোন ছাত্রদ্বারা যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে, সাহিত্য পরিষদের জন্য লইয়া গিয়াছেন। চান্নায় বর্ত্তমান সময়ে মাত্র ত্রিশ ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন।

একদিকে চান্নাগ্রাম যেমন পণ্ডিতমণ্ডলীদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া চতুষ্পাঠী সমূহ হইতে সুকুমার কণ্ঠনিঃসৃত বেদধ্বনিদ্বারা শব্দায়মান হইয়া, সগৌরবে মস্তক উত্তোলন করিয়া, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিত, অন্যদিকে তাহার ইতর জাতীয় সন্তানবর্গের নিষ্ঠুর দস্যুবৃত্তির জন্য কলঙ্কের অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিয়া লজ্জায় তাহাকে অবনতশিরে থাকিতে হইত। চান্নার দস্যুদিগের সংবাদশ্রবণে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

একবার সন্ধ্যার সময় একটী যুবক বেশভূষা পরিধান করিয়া তাহার শ্বশুর গৃহে গমন করিল। একটী মাঠ পার হইলেই তাহার শ্বশুরের গৃহ। কিন্তু তাহার দস্যু পিতা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পথিক হত্যা করিয়া অর্থসংগ্রহের জন্য জঙ্গলের অন্তরালে

হস্তে দণ্ড ধরিয়া যমদূতের মত অপেক্ষা করিতেছিল। ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইল। অন্ধকার ক্রমশঃ ধরণীতল আবরণ করিতে আরম্ভ করিল। দুর্ভাগা যুবক তখন তাহার দস্যু জনকের দৃষ্টিগোচর হইল। দস্যু নক্ষত্রবেগে তাহার সম্মুখীন হইয়া নিষ্ঠুর ভাবে তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল। পুত্র বারবার আর্ত্তস্বরে বলিতে লাগিল "বাবা আমি, আমি তোমার পুত্র। আমাকে মারিও না।" দস্যু বলিল, "প্রাণত্যাগের সময় সব * * ই বাবা বলিয়া মরে।" পুত্র আর্ত্তনাদ করিয়া পলায়ন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু রাক্ষসের হস্তে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিল না; মুহূর্ত্তের মধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। দস্যু তাহার বেশভূষা খুলিয়া লইয়া গৃহে গমন করিল এবং পত্নীর নিকটে পরিশ্রমের পারিতোষিকস্বরূপ সেই সমস্ত উপস্থাপিত করিল। পত্নী আপন তনয়ের পরিচ্ছদ দর্শনে "হা পুত্র" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। মোহবিমূঢ় পুত্র-হন্তারক দস্যু তখন, আপন দুষ্কৃতি হৃদয়ঙ্গম করিয়া, শোকসন্তপ্তচিত্তে, বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক, আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল।

এই দেশে আজ পর্য্যন্ত কথাপ্রসঙ্গে জনসাধারণে বলিয়া থাকে,—

"যদি গেল চান্না
ঘরে উঠ্‌ল কান্না।"

চান্নায় এইরূপ দস্যুভয়ে পথিকগণ তটস্থ হইয়া গমন করিত।

তার পরে চান্নার বিশালাক্ষীর মন্দির।. বিশ্বজননী বিশালাক্ষীর বাসভবনের পরিমাণ নিরনব্বই বিঘা। এই বিরাট ভূমিভাগের অধিকাংশই সুদুর্গম কণ্টকময় জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন, এবং জগজ্জননীর তির্য্যকযোনিজ পশুপক্ষী প্রভৃতি সন্তানবর্গদ্বারা পরিসেবিত। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে এই ভূমিভাগের কিয়দংশ শস্যক্ষেত্রে পরিনত হইয়াছে। জঙ্গলাচ্ছন্ন থাকায়, বিশালাক্ষীর সন্তানবর্গের সাধনক্ষেত্র যেমন নির্জ্জন নিস্তব্ধ, তেমনই বৈরাগ্য ও ভক্তির উদ্দীপক।

এই বিশালাক্ষী কোন সময়ে কাহাদ্বারা প্রতিষ্ঠিতা, তাহা নির্ণয় করিতে কাহারো সাধ্য নাই। এই মন্দিরের অর্চ্চনাপদ্ধতির বিবরণ শ্রবণ করিয়া আমাদের ধারণা হয় জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কোন বৌদ্ধ তান্ত্রিক কর্ত্তৃক এই স্থান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের শুক্লা নবমীতে এই বিশালাক্ষীর মন্দিরে আড়ং মিলিয়া থাকে। বহুস্থান হইতে বহু ভক্ত বিশালাক্ষী দেবীর অর্চ্চনা জন্য নানাবিধ সামগ্রী সঙ্গে করিয়া এইস্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমান

সময়ে যেরূপ পদ্ধতি অনুসারে সর্ব্বত্র দেবীমন্দিরে পূজা হইয়া থাকে এই স্থানের পূজাপদ্ধতির সঙ্গে তাহার বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। দেবী মন্দিরে দেবীর সম্মুখে বলিদানের ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু বিশালাক্ষীর মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে ই ছাগ, মেষ, শূকর, মহিষ, হাঁস, কবুতর প্রভৃতি বলিদান করা হয়। এইরূপ বলির প্রথা শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী কালের তান্ত্রিক সাধকগণের স্থাপিত দেবী-মন্দিরে দৃষ্টিগোচর হয় না। কিছুদিন পূর্ব্বেও কুচবেহার ত্রিপুরা প্রভৃতি বহু প্রাচীন পার্ব্বত্যরাজ্যে দুর্গোৎসবাদির সময় এইরূপ নির্ব্বিচারে হীনপ্রাণীর বলিদান করা হইত। প্রেম ভক্তির অবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে অনেক স্থানে জগজ্জননীর অর্চ্চনায় হীনপ্রাণীর বলিদান রহিত হইয়া গিয়াছে।

যাহা হউক এইস্থানে কোন দেবদেবীর প্রতিমা নাই। তাম্রপাতে নির্ম্মিত পাঁচটী অস্বাভাবিক মুণ্ড আসনের উপরে স্থাপিত আছে। প্রজাপতি নির্ম্মিত কোন প্রাণীর মুখাকৃতির সহিত এই সকল মুণ্ডের সাদৃশ্য নাই। সরলহৃদয় গ্রাম্যলোকে নির্জ্জন জঙ্গলে মন্দির মধ্যে সহসা এই সকল অস্বাভাবিক ভয়োদ্দীপক মুণ্ড দর্শন করিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়। বীরাগ্রগণ্য সাধকগণ সর্ব্বপ্রকার বিভীষিকা ও প্রলোভন জয় করিয়া, যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিরুদ্বিগ্ন শান্ত-স্বভাব না হইতে পারেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মানন্দলাভে কৃতার্থ হন না। এই জন্য তান্ত্রিক সাধকগণের, পূর্ণজ্ঞান বৈরাগ্যে, পূর্ণ অনাসক্তিতে, পূর্ণাভিষিক্ত মহীয়ানগণের বিভীষিকাময় সাধনপদ্ধতির মর্ম্মোদ্ঘাটনে সাধারণ জগৎ সমর্থ হয় না।

বিশালাক্ষীর মন্দিরের পশ্চিমপার্শ্বে একটা পুরাতন পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীর উত্তর পাহাড়ীতে মন্দিরের উত্তর পূর্ব্ব কোণে কমলাকান্তের পঞ্চমুণ্ডের আসন, এবং আসনের উত্তরে ও দক্ষিণে শতাধিক বৎসরের অতি প্রাচীন দুই শাল্মলী বৃক্ষ। কমলাকান্তের পূর্ব্বেও অনেক মহাপুরুষ এই পঞ্চমুণ্ডের আসনে উপবেশন করিয়া সাধনা করিয়াছিলেন। কমলাকান্তের পরে আর কোন মহাপুরুষের সাধনার কথা কেহ কখনও শ্রবণ করে নাই বলিয়া ইহার নাম কমলাকান্তের আসন।

বিশালাক্ষীর মন্দির হইতে প্রায় পাঁচশত হাত উত্তরে খড়িয়া নদীর তীরে পঞ্চাননতলা। এইস্থানে একটী বটবৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষ অত্যন্ত প্রাচীন। ইহার প্রথম সময়ের মূল বা গুণ্ডী নাই। বোঁয়াগুলি স্তম্ভের মত দণ্ডায়মান হইয়া বৃক্ষের শিরোভাগ রক্ষা করিতেছে।

মন্দিরের পূর্ব্বদিকে ভৈরবের আসন। এই আসনও এক বটবৃক্ষমূলে দর্শনীয়। শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়নির্ভরশীল সাধক মহারাজা রামকৃষ্ণের সাধনক্ষেত্র ভবানীপুরে যে বটবৃক্ষ দর্শন করিয়াছিলাম এই বৃক্ষ তাহার অনুরূপ। ইহার গুণ্ডী ঠিক কদমগাছের গুণ্ডীর মত সরল ও সুদীর্ঘ। এই বৃক্ষও অত্যন্ত প্রাচীন। অতিশয় স্থূলা একটী মাধবী লতা এই বৃক্ষের শাখাপ্রশাখাকে আলিঙ্গন করিয়া অবস্থান করিতেছে। এই সকল প্রাচীন বৃক্ষ ও লতা দর্শন করিলে, এইস্থান যে অত্যন্ত প্রাচীন, তাহা সহজেই অনুভূত হয়। সাধককুলগৌরব কমলাকান্তের জীবনাভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ স্বরূপ চান্নাগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই প্রকার। চান্নার বিশালাক্ষীমন্দির এক সময়ে বর্দ্ধমান অঞ্চলের অধিবাসিগণের নিকটে তীর্থমধ্যে পরিগণিত ছিল। কমলাকান্ত শৈশবে পিতৃহীন হইয়া স্নেহময়ী জননীর কোলে লালিতপালিত হইয়াছিলেন, "জননীর স্নেহ সর্ব্বোপরি অতুলনীয়, বিপদের বন্ধু, করুণার সিন্ধু, সন্তানগরবে গরবিণী, জননীর মত আর কেহ নাই," তাহা তিনি সর্ব্বপ্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাই নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ বাল্যকাল হইতেই মাতৃভাবে অন্বিত হইয়া, জয় মা বলিয়া, জগজ্জননীর শ্রীচরণ-কমলে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বিশালাক্ষীর মন্দিরে বিপুল জনসঙ্ঘ একত্র হইয়া "মা, মা" বলিয়া যখন গগনভেদী চীৎকার করিত, তখন কমলাকান্তও তাহাদের সুরে সুর মিশাইয়া, মা নাম ঝঙ্কারে হৃদয়তন্ত্র সঞ্চালিত করিতেন। এইরূপে কমলাকান্ত বাল্যকাল হইতেই মা নাম মন্ত্র সাধনায়, অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।

বহুজন্মের সুকৃতিসম্পন্ন সাধক সর্ব্বদা মন্দিরে যাতায়াত করিতেন এবং বিশ্বদর্শনকারিণী বিশালাক্ষী দেবীর করুণাদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক অবধূত মহাপুরুষ, বিশালাক্ষীর মন্দিরে সাধনা করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি বালক কমলাকান্তের শুদ্ধ সত্বগুণময় আধার দর্শন করিয়া, এবং জন্মজন্মান্তর-সঞ্চিত সাধনপ্রভাব অনুভব করিয়া, তাহাকে কৌলাচারে দীক্ষিত করেন এবং গোপনে সাধন-পদ্ধতি শিক্ষা দেন। গুরুবলে বলীয়ান হইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কমলাকান্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি একদিকে যেমন জগজ্জননীর পাদপদ্মে অনন্য ভক্ত ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি যোগের কৌশলে সমাধিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ছাত্রজীবনে কমলাকান্ত অধ্যয়নে বিশেষ মনোযোগ করিতেন না। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক তিরস্কার করিয়াও তাঁহাকে অধ্যয়নে বসাইতে পারিতেন না। কিন্তু পাঠ আবৃত্তি করিবার সময় তিনি অন্যান্য সহাধ্যায়িগণ অপেক্ষা, সমস্ত

বিষয়ে বিশেষরূপে পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিতেন। তখন তিনি অন্য কোন অধ্যাপকের নিকটে অধ্যয়ন করেন বলিয়া তাঁহার অধ্যাপকের মনে সন্দেহ হয়, এবং কোথায় কাহার নিকটে তিনি অধ্যয়ন করেন, জানিবার জন্য অধ্যাপক অনুসন্ধান আরম্ভ করেন।

অধ্যাপক একদিন দেখিলেন, কমলাকান্ত অতি প্রত্যূষে বিশালাক্ষীর মন্দিরে গমন করিতেছেন। তিনি সংগোপনে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কমলাকান্ত মন্দিরের পশ্চাতে নির্জ্জনস্থানে এক আসন পাতিয়া তাহাতে পদ্মাসনে উপবেশন করিলেন এবং একাসনে বেলা দেড় প্রহর পর্য্যন্ত ধ্যানস্থ রহিলেন। অন্য এক-দিন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় দেখিলেন, বালক কমলাকান্ত ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, শিমূলতলার পঞ্চমুণ্ডের আসনে যাইয়া, যোগাসনে উপবেশন করিলেন, এবং প্রভাত পর্য্যন্ত ধ্যানস্তিমিতনেত্রে একাসনে নিশ্চল রহিলেন।

অন্য একদিন কমলাকান্তকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপক তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন, এবং দেখিলেন, তিনি প্রাণশূন্য মৃতদেহের মত বিশালাক্ষীর পুষ্করিণীর জলে ভাসমান। তখন সকলে যেমন চমৎকৃত তেমনই শঙ্কিত হইলেন। কমলাকান্ত জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন, ইহাই সকলে স্থির করিলেন এবং চীৎকার করিয়া অনেক গ্রাম্য লোক একত্র করিলেন। কমলাকান্তের দেহ সলিল হইতে উত্তোলন করা হইল। তখন সকলে দেখিলেন, তিনি সমাধিস্থ। এইরূপে পরীক্ষা করিয়া অধ্যাপকের মনের সন্দেহ বিদূরিত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন কমলাকান্ত সাধারণ বালক নহেন। সিদ্ধ পুরুষের কার্য্যকলাপ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন, এবং কমলাকান্তকে সসম্মানে সমাদর করিতে লাগিলেন। সাধক-কুল-গৌরব কমলাকান্তের সাধনবিভূতির কীর্ত্তিপতাকা, যৌবনের প্রারম্ভেই উচ্চগগনে উড্ডীয়মান হইল।

নির্ভরশীল সাধক অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া অধ্যাপক হইলেন। অধ্যাপক-মণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রাপ্ত হইলেন। মহাবিদ্যার গৌরবের সন্তান, সাধুতা, পাণ্ডিত্য ও যৌগিক বিভূতির বলে, সর্ব্বসমাজে সুপরিচিত ও আরাধনীয় হইলেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া, ধর্ম্মপত্নী গ্রহণ করিলেন এবং গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া, ত্রিতাপ-পরিপূর্ণ সংসারের বন্ধুর পথে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু মনবুদ্ধি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনীর শ্রীপাদপদ্মে সাবধানে অর্পিত রাখিলেন। দিবা রাত্রির অধিকাংশ সময় কমলাকান্ত বিশালাক্ষীর

মন্দিরে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ধ্যানধারণায় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার মাতুল-বংশীয় ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। ধর্ম্মদাস সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। কমলাকান্ত পদাবলি রচনা করিয়া দিতেন, তিনি তাহাতে সুরলয় সঙ্গত করিয়া, বিশালাক্ষীর মন্দিরে কীর্ত্তন করিতেন। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল।

কমলাকান্ত সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক। তাঁহার চতুষ্পাঠীর ছাত্রসংখ্যা অন্যান্য চতুষ্পাঠী অপেক্ষা অনেক অধিক। কিন্তু তিনি অধিকাংশ সময় বিশালাক্ষীর মন্দিরে অবস্থান করায়, তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর অধ্যয়নের বিশেষ অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। অনেক ছাত্র তাঁহার নিকটে বিশালাক্ষীর মন্দিরে যাইয়া অধ্যয়ন করিয়া আসিতে লাগিলেন। ক্রমে দশবৎসর অতীত হইল। তাঁহার অনেক ছাত্র দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইলেন। তখন অধ্যয়নপরায়ণ ছাত্রগণকে অধ্যাপক ছাত্রগণের নিকটে পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। নিজে প্রিয়তম সঙ্গী ধর্ম্মদাসের সঙ্গে, জগজ্জননীর মহিমাকীর্ত্তনে, পরমানন্দে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। তখন মাত্র নামতঃ সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক রহিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ বিশালাক্ষীর সেবাইত হইলেন।

তখন অধ্যাপকমণ্ডলীর অর্থাগমের সর্ব্বপ্রধান উপায় ছিল নিমন্ত্রণ পত্র। কোন স্থান হইতে নিমন্ত্রণের পত্রী আসিলে কমলাকান্ত নিজে না যাইয়া ছাত্র-দিগকে পাঠাইয়া দিতেন। স্বভাবত উদাসীন সাধক অর্থাগমের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলেন। নিষ্ঠুর দারিদ্র্য অবসর প্রাপ্ত হইয়া, কমলাকান্তের গৃহস্থলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সর্ব্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যের উৎসাদন করিতে আরম্ভ করিল।

ভগবচ্চরণে একান্ত নির্ভরশীল সাধকগণের যথার্থ উত্তরসাধক দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের পেষণে তাঁহাদের অন্তঃকরণ স্মরণ মননের দৃঢ়তায় অন্বিত হয়। সাধনার সর্ব্বপ্রধান বৈরী অহঙ্কার নামক অসুরকে দারিদ্র্য মার্জ্জনী মারিয়া দূর দূরতম দেশে দূর করিয়া দেয়। যে গৃহে দারিদ্র্যের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, বৃথা উৎপাতকারী বিলাসিতার অন্ধকার তাহার সীমান্তেও উপস্থিত হইতে পারে না। পরনিন্দা, পরহিংসা, পরশ্রীকাতরতা, দারিদ্র্যের সংসারে প্রবেশ করে না। দারিদ্র্যপীড়িত হৃদয়ে সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বরের চিন্তা সর্ব্বদা বিরাজ করে। আর দরিদ্রের রসনায়, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে, সেই সর্ব্বনিয়ন্তার পবিত্র নাম উচ্চারিত হয়। তাই সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বসমাজের সাধকগণকে সর্ব্বাগ্রে দারিদ্র্য আলিঙ্গন করিতে দর্শন করি। দরিদ্রের গৃহ শ্রীভগবানের যথার্থ মন্দির।

কমলাকান্ত এখন আর সপ্তাহেও একদিন বাড়ীতে প্রবেশ করেন কি না সন্দেহ। দিবারাত্রি আদ্যাশক্তি বিশালাক্ষীর মন্দিরে বসিয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকেন। বহু লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া ফলমূলমিষ্টান্নাদি যাহা প্রদান করেন সমস্তই জগজ্জননীর সেবায় অর্পণ করেন।

একদিন রাত্রি আড়াই প্রহর অতীত হইয়াছে এমন সময় কমলাকান্ত পঞ্চমুণ্ডের আসনে উপবেশন করিয়া, রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, আনন্দময়ী মায়ের আনন্দে আত্মহারা হইয়া, কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—

"আদর করি হৃদে রেখো, আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন মন কেউনা দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকী, মন, তোমায় আমায় চল দেখি,
রসনারে সঙ্গে রেখো, সে যেন মা বলে ডাকে॥
অজ্ঞান কুমন্ত্রী দেখ, নিকট হতে দিও নাকো,
জ্ঞানেরে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে॥
কমলাকান্তের মন, তোমায় এক নিবেদন,
দরিদ্রে পাইলে ধন, সে কি অযতনে রাখে॥"

বেহাগ—আড়া॥

জগজ্জননীর জগৎভরাভাবে নিমগ্ন হইয়া অনন্য অন্তরে কমলাকান্ত গান করিতেছিলেন। সহসা যেন মানুষের সমাগম অনুভব করিলেন, তাঁহার বোধ হইল, যেন কেহ তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ করিতে বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি আসন হইতে উত্থিত হইয়া চারিদিক অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন আসিয়া আবার আসনে উপবেশন করিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

পুনরায় মানুষের সমাগম অনুভব করিলেন। এবার প্রদীপ জ্বালিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। মন্দিরের সম্মুখে গমন করিলেন। দেখিলেন, মন্দিরের দ্বার কে যেন উন্মুক্ত করিয়াছে। তখন মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান করিলেন। কাহাকেও না দেখিয়া, মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া, আবার আসিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। এবার আর কীর্ত্তন করিলেন না। কিন্তু সহসা শাল্মলী বৃক্ষের অন্তরাল হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, "আর একটা গান গাও।"

কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

একটী প্রৌঢ়া বিধবা স্ত্রীলোক কমলাকান্তের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "আমি ধর্ম্মনারায়ণের মা। ফুল তুলিতে আসিয়াছিলাম। তোমার গান শুনিতে এখানে আসিলাম।"

ধর্ম্মনারায়ণ জাতিতে গোয়ালা। সে বিশালাক্ষীর মন্দিরে দুগ্ধ দধি ক্ষীর ছানা ইত্যাদি প্রদান করিত। সে কমলাকান্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। খাঁকীবাবা বলিয়াছিলেন, "এই ঘটনার পর হইতে ধর্ম্ম কমলাকান্তের সেবক হইয়াছিল।"

ধর্ম্মের জননী মুখের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া কমলাকান্তের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। কমলাকান্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, আর এক একবার তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণসুধাকর সদৃশ নয়ন-মনোহর মুখকান্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সে রূপ দর্শন করিয়া কমলের হৃদয়ে ভাবের তরঙ্গ উথিত হইল। তিনি আত্মহারা হইয়া মা নাম কীর্ত্তনে আকুল হইয়া পড়িলেন। তখন ধর্ম্ম-নারায়ণের জননী তাঁহাকে কোলে তুলিয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন। এদিকে পূর্ব্ব-দিকের আকাশ পরিস্কৃত হইয়া তরুণ অরুণের আগমন সংবাদ প্রচার করিল। জননী কমলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। সহসা মন্দিরের দুয়ারে শব্দ হইল। কমলাকান্ত উঠিয়া মন্দিরের সম্মুখে গমন করিলেন। দেখিলেন কে যেন আবার মন্দিরের দুয়ার উন্মুক্ত করিয়াছে। তিনি এবার কিছু চমৎকৃত হইলেন। আবার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কে দ্বার উন্মুক্ত করিল, তাহা অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু কাহাকেও না দেখিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া কিছুক্ষণ বারাণ্ডায় বসিয়া রহিলেন।

অন্তরে কেবল ধর্ম্মনারায়ণের জননীর মুখকান্তি তরঙ্গায়িত হইতেছিল। তিনি আর একবার সেই ভুবনভরা রূপরাশি দর্শন করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহার অন্বেষণে পুষ্পোদ্যানে গমন করিলেন, সেখানে না দেখিয়া ধর্ম্মনারায়ণের গৃহে গমন করিলেন এবং "মা" বলিয়া এক ডাক ছাড়িয়া, মূর্চ্ছিত হইয়া, প্রাঙ্গণে পতিত হইলেন। পাড়ার লোক একত্র হইল; সকলের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কমলাকান্ত সে পাড়ায় জীবনে কখন গমন করেন নাই।

সকলে শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলে তিনি ধর্ম্মনারায়ণকে বলিলেন, "তোমার মা কোথায়?"

ধর্ম্মনারায়ণ চমৎকৃত হইয়া বলিতে লাগিল, "দেব, আমার আবার মা

কোথায়? বয়স যখন মাত্র তিন মাস তখন মা আমার স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া অনন্ত আকাশে অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন। এক বৎসর বয়সের সময় আমার পিতৃদেব আমাকে দুর্গতির গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া আপনার অভীষ্ট লোকে গমন করিয়াছিলেন। এক মাসীমার কোলে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম, তিনিও আজ দশবৎসর ইহলোক ত্যাগ করিয়া আমার পিতামাতার দেশে গমন করিয়াছেন। এখন আমি কেবলমাত্র দেহধারণের জন্য ব্যবসা করি। আর আপনার শ্রীমুখে মা নামের মহিমা শ্রবণ করিয়া, মার জন্য মন যখন বড় ব্যাকুল হয়, তখন বিশ্বজননী বিশালাক্ষীর মন্দিরে যাইয়া মা মা বলিয়া হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করি। আমার মা ঐ বিশালাক্ষী, আর আমার বাবা সেই বিশ্বেশ্বর।" ধর্ম্মনারায়ণের কণ্ঠ ভক্তির আবেগে রুদ্ধ হইয়া গেল।

ধর্ম্মনারায়ণের সমস্ত কথা কমলাকান্ত নীরব নিষ্পন্দ হইয়া শ্রবণ করিলেন। শ্রবণের সময় তাঁহার নয়ন ফাটিয়া জলধারা বহির্গত হইয়া ধরাতল পর্য্যন্ত সিক্ত করিতে লাগিল। কমলাকান্ত সমস্ত বুঝিলেন, উন্মাদের মত বিশালাক্ষীর মন্দিরে গমন করিলেন। অগণ্য লোক তাঁহার সঙ্গে বিশালাক্ষীর মন্দিরে উপস্থিত হইল। তিনি মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া কখনও হাসিতে লাগিলেন, কখনও কান্দিতে লাগিলেন। শেষে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায় আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিলেন। সে দিন কীর্ত্তনানন্দে বিশালাক্ষীর বিস্তৃত ভবন ঝঙ্কারিত হইল।

অন্য একদিন কমলাকান্ত মৎস্যের অভাবে চিন্তিত হইয়াছিলেন। এইস্থানে প্রত্যহ মৎস্যের ব্যঞ্জনে বিশালাক্ষীর ভোগ প্রদত্ত হইত। বহু চেষ্টায়ও সেদিন মৎস্য সংগৃহীত হইল না। মাতৃগতপ্রাণ কমলাকান্ত বিশালাক্ষীর ভোগের অন্তরায় ঘটিল বলিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। রাত্রি আসিল। আজ আর তাহার চক্ষে রাত্রিতে ঘুম আসিল না। তিনি গভীর রাত্রে পঞ্চমুণ্ডের আসনে উপবেশন করিয়া আপন মনে জগজ্জননীর মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

কমলাকান্ত কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় পুষ্করিণীর দক্ষিণতীরে যেন জল সঞ্চালনের শব্দ উত্থিত হইল। তিনি সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ওখানে কে গো?"

উত্তর আসিল, "আমরা মাছ ধরিতেছি।"

কমলাকান্ত, "তোমার নাম কি?"

উত্তর আসিল, "নারী বাগ্দী।"

কমলাকান্ত, "যদি মাছ পাও, আমাকে দিও। আজ মায়ের ভোগে ব্যঞ্জন দেওয়া হয় নাই।"

কিছুক্ষণ পরে নারী বাগ্দী কমলাকান্তের নিকটে আসিয়া দুইটী মাগুর মাছ ও একটী শালমাছ তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত করিল। প্রদীপের আলোকে কমলাকান্ত তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন, নারী বাগ্দীর রূপের সীমা নাই। তাহার কৃষ্ণবর্ণ কলেবর হইতে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব নয়নমনোহর জ্যোতি বাহির হইতেছে। সেই জ্যোতিতে প্রদীপের আলোক ম্রিয়মাণ হইয়া গেল—সেই জ্যোতির্ম্ময় কৃষ্ণকান্তিতে রজনীর অন্ধকার মুহূর্ত্তের জন্য বিদূরিত হইল এবং বৃক্ষলতা নীলকান্তিমাখা হইয়া দৃশ্যমান হইয়া উঠিল। ধীবরযুবতীর ত্রিভুবনমোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কমলাকান্ত চমৎকৃত হইলেন। তাহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কলেবর পর্য্যন্ত কেশ-পাশ-নিবদ্ধ কুন্তল, আকর্ণ-বিস্তৃত বিস্ফারিত নয়নদ্বয়, নীলকান্তিময় বদনমণ্ডলে মৃদুহাস্যযুক্ত বিম্ববিনিন্দিত অধরোষ্ঠ, শরদেন্দু-শোভিত নীলাকাশ তুল্য সিন্দূর-বিন্দু-পরিহিত জ্যোতির্ম্ময় বিস্তৃত ললাট, মৃণাল-বিনিন্দিত ভুজযুগল প্রভৃতি, এবং প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ এক ধেয়ানে তিনি দর্শন করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন, ধীবরজাতির গৃহে এমন অলোকসামান্যা প্রতিভাময়ী রূপবতী থাকিতে পারে, তাহা স্বপ্নেরও অগোচর। এই ভয়ঙ্কর স্থানে এই নিশীথ সময়ে এই দুঃসাহসিনী রমণী কোথা হইতে আসিল! এই যুবতী কোন্ ধীবরের গৃহলক্ষ্মী! সে কেন সঙ্গে আসিল না। কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি একা আসিয়াছ? তোমার ভয় নাই?

নারী বাগ্দী—"আমি চিরকালই একাই আসি। তবে আমার আরও দুইজন সঙ্গিনী আছে। তুমি যখন এখানে থাক, তখন এখানে আসিতে ভয় কি? আর, আমি ত সর্ব্বদাই এখানে আসি যাই। আসিয়া তোমার গান শুনি।"

কমলাকান্ত—"বটে তুমি সর্ব্বদাই আস যাও! কিন্তু আমি ত তোমাকে আর কখনো দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তুমি কি আমাকে চেন?"

নারী বাগ্দী—"চিনি বই কি, তোমাকে আবার কে না চেনে। যাহারা তোমারমত সর্ব্বস্ব ভুলিয়া, দিবারাত্রি মা মা বলিয়া, গান করে, তাহাদিগকে সকলেই চেনে। তুমি যখন মা মা বলিয়া গান গাও, তখন আমার মনপ্রাণ পাগল হইয়া তোমার নিকটে ছুটিয়া আসে। তোমাকে আবার চিনি না?"

কমলাকান্ত—"বটে, তুমি আমাকে চেন, কিন্তু আমি ত তোমাকে চিনি না।"

নারী বাগ্দী—"যদি না চিনিয়া থাক, তবে আজ চিনিয়া রাখ, আর, যদি না দেখিয়া থাক, তবে এখন ভাল করিয়া দেখিয়া রাখ, পরে আর ভুল হইবে না। তুমি বিশালাক্ষীর ভোগের জন্য মাছ পাও নাই, তাই তোমাকে মাছ দিতে আসিলাম। এখন আমি যাই।"

কমলাকান্ত আসন হইতে উত্থিত হইলেন, যুবতীর সঙ্গে গমন করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু লজ্জা ও শিষ্টাচার তাঁহার গতি রোধ করিল। যুবতী আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, মৃদুমধুর হাস্যে বনভাগ উদ্ভাসিত করিয়া, সস্নেহবচনে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাও?"

কমলাকান্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "মাছের মূল্য ত দিতে পারিলাম না।"

নারী বাগ্দী—"কাল দিও।"

কমলাকান্ত আসনে উপবেশন করিয়া, যতদূর দৃষ্টি চলিল, এক ধেয়ানে নারীবাগ্দীকে দেখিতে লাগিলেন। মরালগামিনী নারীবাগ্দী মৃদুমন্দ গমনে দৃশ্যের অতীত জঙ্গলে প্রবেশ করিল। বিশালাক্ষীর সেবাপরায়ণ পরম ভাগবত, কমলাকান্ত, বিশালাক্ষীর ভোগের জন্য যে উদ্বেগে অস্থির হইয়াছিলেন, মৎস্য প্রদান করিয়া নারীবাগ্দী সে উদ্বেগের অবসান করিয়া গেল।

যিনি ভ্রান্তিরূপিণী, যাঁহার মায়ায় ত্রিজগৎ ভ্রান্তিময়, কত হরিহরবিরিঞ্চি যাঁহার মায়ায় ভ্রান্ত হইয়া, সামান্য জীবের মত হাসি-কান্নার অধীন হন, কমলাকান্ত সন্তান হইয়াও তাঁহার মায়া অতিক্রম করিতে পারিলেন না।

নারীবাগ্দী অন্তর্হিতা হইল। কমলাকান্ত চমকিয়া উঠিলেন, তাহাকে পুনর্ব্বার দর্শন করিবার জন্য উন্মত্ত হইলেন; সর্ব্বাঙ্গ ভাবের আবেগে ঘর্ম্মাক্ত হইল, তাহার গমনপথে দ্রুতপদে ধাবমান হইলেন, এবং "নারীবাগ্দী, নারীবাগ্দী" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু আর তাহার সন্ধান পাইলেন না।

রজনী প্রভাতা হইল। দিনকরের উদয়ে ধরণীতল দৃশ্যমান হইল। কমলাকান্ত মৎস্যের মূল্য দান করিতে সমগ্র চান্না অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু সেই ত্রিলোকভুলানী ইন্দ্রনীলরত্নবরণা নারীবাগ্দীকে আর দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার সমস্ত কথা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; যে একদিকে করুণাময়ী অন্যদিকে ছলনাময়ী, তাহার খেলা তখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন; তখন ভক্তির আবেগে ভাবের আবেগে, হর্ষবিষাদে, অজ্ঞান, অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

মাতুলান্নে প্রতিপালিত কমলাকান্ত মাতুলালয়েই অবস্থান করিতেন। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের পর ক্রমশঃ পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল। উপার্জ্জন নাই, কাজেই অভাব দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মাতুলের সংসারও কাল-চক্রে অস্বচ্ছল হইয়া উঠিল। তখন ব্রাহ্মণীর তাড়নায়, সংসারের অভাব মোচন করিবার নিমিত্ত, তিনি সাহায্যপ্রার্থী হইয়া, বর্দ্ধমান রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

এই সময় বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ বাহাদুরের দয়াদাক্ষিণ্যের যশঃকীর্ত্তনে সমগ্র দেশ মুখরিত হইয়াছিল। তিনি পরম ভাগবত, পরদুঃখকাতর, পরোপকারে মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার ক্ষমা বশিষ্ঠের মত, উদাসীনতা রাজর্ষি জনকের মত, এবং দান দাতাকর্ণের মত ছিল। এইস্থানে তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

একবার একটী মোক্তার রাজভাণ্ডার হইতে বহু অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করে। বহুদিন পরে বহু কষ্টে সে ধৃত হয় এবং মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ বাহাদুরের সম্মুখে আনীত হয়। মহারাজ বাহাদুর তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রাজভাণ্ডার হইতে অর্থাপহরণ করিয়াছিলে?"

মোক্তার—"মহারাজ! কেবল অভাবের পেষণে জর্জ্জরিত হইয়া চুরি করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।"

মহারাজ—"সেই অর্থদ্বারা কি কর্ম্ম করিয়াছ?"

মোক্তার—"সে অর্থদ্বারা জলশূন্যস্থানে জলাশয় খনন করিয়াছি, দেবালয়ের সংস্কার করিয়াছি, টোল স্থাপন করিয়াছি, এবং যাহা অবশিষ্ট ছিল সপরিবারে তাহা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছি। মহারাজ, অর্থাভাবে জলাশয় খনন এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

মোক্তারের উত্তর শুনিয়া সদাশয় মহারাজ বাহাদুর সন্তুষ্ট হইলেন এবং জলাশয় খনন সম্পূর্ণ করিতে আরও দুই হাজার টাকা তাহাকে প্রদান করিতে দেওয়ানকে আদেশ করিলেন। মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ বাহাদুরের কীর্ত্তি-কথার সীমা নাই। বর্দ্ধমানের একশত আট শিবের মন্দির এবং অন্যান্য অনেক দেবালয় তাঁহার সময়ে নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার ভাণ্ডার সাধু-সজ্জনগণের সাধুকর্ম্মের সাহায্যের জন্য, দীন দরিদ্র প্রজাবর্গের অভাব মোচনের জন্য, এবং জনসাধারণের হিতসাধনের জন্য, সর্ব্বদা মুক্ত থাকিত।

তাঁহার যোগ্যপুত্র ছোট মহারাজ প্রতাপচন্দ বাহাদুর। তিনি যেমন

প্রতিভাশালী তেমনই সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ও পরদুঃখকাতর ছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার সাধনায় যোগিজনবাঞ্ছিত একাগ্রতায় সমলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি যখন যে কার্য্য আরম্ভ করিতেন তখনই তাহার চূড়ান্ত সীমায় উপস্থিত হইতে পারিতেন।

সাধন-গগনের উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ, চুপীনিবাসী মহাশয় রঘুনাথ রায়, মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের দেওয়ান ছিলেন। বর্দ্ধমানের চিরপ্রশংসিত রাজভবন, যে সময় এইরূপ পিতাপুত্র ও দেওয়ান দ্বারা সমলঙ্কৃত ছিল, সাধক-কুল-তিলক কমলাকান্ত তখন অভাবগ্রস্ত হইয়া, পত্নীর উত্তেজনায় সাহায্যের জন্য বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কমলাকান্ত সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলে প্রহরিগণ তাঁহাকে সামান্য ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ জ্ঞানে প্রথমে উপেক্ষা করে কিন্তু শেষে তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিমুগ্ধ হয় এবং তাহারাই কিছু অর্থ তুলিয়া তাঁহাকে প্রণামী প্রদান করে। বালকস্বভাব কমলাকান্ত তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া সেদিনের মত চান্নায় প্রত্যাগমন করেন।

কিছুদিন পরে আবার একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রহরিগণ তাঁহাকে পরম সম্মান ও ভক্তি সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া উপবেশন করাইল। তিনি তাহাদের প্রার্থনায় জগজ্জননীর গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সেই সময় জগজ্জননীর গৌরবের সন্তান দেওয়ান রঘুনাথ রাজসভায় প্রবেশের নিমিত্ত সিংহদ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, এবং সাধক-কুলতিলক কমলাকান্তের অমৃত-নিস্যন্দিনী পদাবলি শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কমলাকান্তের গুণগৌরবের কীর্ত্তিপতাকা বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই বর্দ্ধমানগগনে উড্ডীয়মান হইয়া উন্নত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। দেওয়ান রঘুনাথ আজ কমলাকান্তকে দর্শন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে সসম্মানে মহারাজা-ধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের রাজসভায় লইয়া উচ্চাসনে উপবেশন করাইলেন।

গুণগ্রাহী মহারাজাধিরাজ গুণসিন্ধু কমলাকান্তের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পঞ্চাশ টাকা অর্থ সাহায্য প্রদান করিলেন, এবং ভবিষ্যতে তাঁহার সমস্ত অভাব পূর্ণ করিবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও সাধন-প্রতিভা দর্শন করিয়া, মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর ক্রমে অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দ্বারপণ্ডিতের উচ্চপদ প্রদান করিলেন, এবং কোটালহাটে তাঁহার সাধনাসন নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।

কমলাকান্তের গুণাবলি দর্শন করিয়া বর্দ্ধমানের বহুলোক তাঁহার প্রতি

শ্রদ্ধাযুক্ত হইল, এবং কি সহর কি দূরবর্ত্তী গণ্ডগ্রাম, সমস্ত স্থান হইতে দলে দলে ধর্ম্মপ্রাণ লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল। কমলাকান্ত বৎসরের অধিকাংশ সময় কোটালহাটে বাস করিতে লাগিলেন। দেওয়ান রঘুনাথ তাঁহার একজন সাধনাসহায় সঙ্গী হইলেন। ছোট মহারাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। বর্দ্ধমানে আসিয়া তিনি বর্দ্ধমান-সমাজে সাধন-প্রতিভা প্রচার করিবার উত্তম সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন।

বর্দ্ধমানের রাজভাণ্ডার হইতে প্রতিমাসে তাঁহাকে দুইশত টাকা সাহায্য করা হইত। গুরুগতপ্রাণ শিষ্যগণের গৃহ হইতেও প্রতিবৎসর বহু অর্থ ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগৃহীত হইত। কমলাকান্ত অর্থাগম দর্শন করিয়া প্রতিবৎসর চান্নায় মাতুলালয়ে দুর্গোৎসব করিতেন। দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে কোন কোন বৎসর দূরবর্ত্তী শিষ্যালয়ে গমন করিতেন।

একবার শিষ্যবাড়ী হইতে বহু পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া, দশ বারখানা গাড়ী বোঝাই করিয়া, পূজার পূর্ব্বে চান্নায় যাইতেছিলেন। ওড়গ্রামের ডাঙ্গায় আসিলে রাত্রি হইল এবং একদল দস্যু তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া, গাড়োয়ান-দিগকে তাড়াইয়া দিয়া, গাড়ীগুলিকে তাহাদের ইচ্ছামত পথে চালাইতে লাগিল। কমলাকান্ত তখন অনন্যোপায় হইয়া, সকল সঙ্কটে মুক্তিলাভের উপায়, শরণাগতপালিনী, শ্যামা মাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

"আর কিছু নাই শ্যামা তোমার কেবল দুটী চরণ রাঙা।
তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি শুনে হলেম সাহস ভাঙ্গা॥
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সুখের সময় সবাই তারা,
বিপদকালে কেউ কোথা নাই ঘরবাড়ী ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা॥
নিজগুণে যদি রাখ, করুণানয়নে দেখো,
নইলে জপ করি যে তোমায় পাব, সেত কেবল ভূতের সাঙ্গা॥
কমলাকান্তের কথা, মাকে বলি মনের ব্যথা,
তার জপের মালা ঝুলি কাঁথা, জপের ঘরে রইলো টাঙ্গা॥"

দস্যুদল কমলাকান্তের অমৃতময় মা নাম ঝঙ্কার শ্রবণ করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি আবার রজনীর অন্ধকারে, নির্জ্জনপ্রান্তরে, তরঙ্গ তুলিয়া গান করিতে লাগিলেন—

"ওমা ত্রিনয়না, কেমন তোর করুণা,
আমায় দিয়ে জানা, গেল গো এবার॥

আত্মপুণ্যে নর, যদি হয় উদ্ধার,
মাহাত্ম্য কি তোমার তাতে ?
এ মা, পুণ্যপথে যেতে যেতে।
আমি হীন ভক্তি, আমায় দিতে মুক্তি
আদ্যাশক্তি শক্তি না হল তোমার ॥
গর্ভবাসে ছিল বাসনা বৈরাগ্য,
ভববাসে এসে হল উপসর্গ,
মা তোমার চরণে দিতে পাদ্যঅর্ঘ্য, বাসনা ছিল মা মনে।
ভজ্‌ব কি ভক্তি না দিলে, মজ্‌ব কি মজালে কালে,
পূজ্‌ব কি মা বিল্বদলে, হল রিপুগণ বাদী অনিবার ॥
শিবের আজ্ঞায় স্থির ছিলেম এ অবধি,
এখন দেখি শিব হলেন মিথ্যাবাদী,
শিবের দোহাই দিয়ে মিছে তোমায় সাধি,
মিছে কাঁদি দুর্গা বলে।
ইহকাল গেল অসুখে, বঞ্চিত হলেম পরলোকে,
কমলের কর্ম্মবিপাকে, কলুষপাতকী না হল উদ্ধার ॥”

কমলাকান্ত এইরূপে জগদ্ধাত্রীর গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। দস্যুদলপতি তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া, ভক্তিভাবে অন্বিত হইয়া, তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিল, কৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিল, সমস্ত সামগ্রী তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিল, এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিল। কমলাকান্ত নির্ব্বিঘ্নে চান্নায় গমন করিয়া মা জগদম্বার অর্চ্চনোৎসব শেষ করিলেন, এবং বিশালাক্ষীর মন্দিরে শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া, কোটালহাটের সাধনাসনে গমন করিলেন।

কমলাকান্ত কেবল ভক্তিমার্গের সাধক ছিলেন না, যোগের অষ্টাঙ্গ সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সবিকল্প সমাধির পরিচয় বাল্যকালেই প্রচারিত হইয়াছিল। ছোট মহারাজ প্রতাপচন্দ বাহাদুর কমলাকান্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিতে একাগ্র অন্তরে সাধনা আরম্ভ করিলেন, এবং অসাধারণ প্রতিভাবলে, অতি অল্পকাল মধ্যেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন।

তিনি বিদেহমুক্ত পুরুষের মত কখনো কলেবর হইতে বহির্গত হইয়া শূন্যে শূন্যে ভ্রমণ করিতে পারিতেন, আবার ইচ্ছামত নিজদেহে প্রবেশ করিতে

পারিতেন; ইচ্ছানুসারে সবিকল্প সমাধিস্থ হইয়া, জীবনহীন শবের মত পড়িয়া থাকিতে পারিতেন। তিনি জ্ঞানবিচারেও "জগৎমিথ্যা" হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সংসারকে ভোজবাজীর রঙ্গমঞ্চ মনে করিতেন, জীবন মরণকে পুতুলখেলার অভিনয়ের মধ্যে গণ্য করিতেন, এবং জীবন্মুক্ত পুরুষের মত সর্ব্বদা উদাসীন ভাবে ভ্রমণ করিতেন। বংশের একমাত্র পুত্র ছোট মহা-রাজ প্রতাপচন্দ্রকে এইরূপ বিষয়াসক্তিশূন্য রাজকার্য্যে উদাসীন দর্শন করিয়া মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র ক্রমে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন।

কমলাকান্ত কৌলসাধক ছিলেন। প্রতাপচন্দ্র কমলাকান্তের অনুকরণে, সাধনাসনে বসিবার পূর্ব্বে, কারণ গ্রহণ অভ্যাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু শেষে পরিমাণ স্থির রাখিতে পারিলেন না। তিনি মদ্যপায়ী নামে অভিহিত হইলেন। শরীরে বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইল, এবং অল্পকাল মধ্যে যোগযুক্ত কান্তিময় কলেবর শিথিল ও শ্রীহীন হইতে লাগিল। মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর প্রাণপ্রিয়তম পুত্রের অবস্থা দর্শন করিয়া, অধিকতর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং কমলাকান্তকে সমস্ত দোষের হেতু বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন। মহারাজাধিরাজের মোসাহেব দল অমনি সুর পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার সন্দেহে অনুকূলবাতাস প্রদান করিতে লাগিল। বর্দ্ধমানবাসীর সমুজ্জল গৌরবস্তম্ভকে, তাহারা মাতাল ও ভণ্ড বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। কমলাকান্তের গুণপক্ষপাতী, মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর, সন্দেহের অন্তরে, তাঁহার দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদিন কমলাকান্ত নিকটবর্ত্তী খোলাভাটী হইতে মদ কিনিয়া, এক ঘটীর মধ্যে করিয়া, লইয়া যাইতেছিলেন। তেজচন্দ্র বাহাদুরের শিবিকাও সেই পথ বাহিয়া গমন করিতেছিল। মোসাহেবগণের মুখে সংবাদ পাইয়া, মহারাজাধিরাজ সহসা কমলাকান্তের সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘটীর মধ্যে কি আছে?"

কমলাকান্ত—"ঘটীর মধ্যে দুধ আছে।"

মহারাজাধিরাজ—"দেখি কেমন দুধ?"

কমলাকান্ত ঘটী হইতে কিয়দংশ মহারাজাধিরাজের সাক্ষাতে মাটীতে ঢালিতে লাগিলেন। মহারাজাধিরাজ দেখিলেন, সত্যই দুধ। তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তাঁহার মোসাহেবগণ লজ্জায় মর্ম্মাহত হইল। আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, সেদিনের মত সকলে প্রাসাদাভিমুখে গমন করিলেন।

কিন্তু প্রাণপ্রিয়তম একমাত্র পুত্র ছোট মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের মদ্যপানাসক্তি

ও বিষয়কর্ম্মে উদাসীনতা চিন্তা করিয়া এবং শক্তিমান সাধক কমলাকান্তের সাধন বিভূতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ হইয়া, মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ বাহাদুর শৃঙ্খলাবদ্ধ শক্তিমান সিংহের মত, অন্তর্জ্বালায় ক্রমশঃ জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণে সন্দেহমিশ্রিত বিরক্তির প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া, কমলাকান্তের সহিত মিলিত হইবার জন্য যে অনুরাগ-সেতু নির্ম্মিত ছিল, তাহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভাসাইয়া দিল। পরশ্রীকাতর, ইতরবুদ্ধিবিশিষ্ট মোসাহেব দল, প্রত্যহ কমলাকান্তের নিন্দা রটাইয়া, সেই বিরক্তির প্রবাহে অনুকূল বাতাস প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ বাহাদুরের প্রশান্ত হৃদয় তরঙ্গায়িত হইয়া তাঁহাকে হতবুদ্ধি করিয়া ফেলিল।

মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ বাহাদুর একদিন কমলাকান্তকে আপন কক্ষে আহ্বান করিয়া, অপ্রসন্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি সেদিন ঘটী হইতে যে দুধ ঢালিয়া আমাকে দেখাইয়াছিলেন সেই দুধে কি ঘৃত প্রস্তুত হইতে পারে?"

সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন, ধীমানাগ্রগণ্য কমলাকান্ত মহারাজাধিরাজের অন্তর অনুভব করিয়া, ধীরতার পর্ব্বত ঈষৎ বিচলিত হইয়া, ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "দুগ্ধে ঘৃত নিশ্চয়ই উৎপন্ন হয়।"

মহারাজাধিরাজ—"সেই ঘৃতদ্বারা, আপনার কালীপূজার সময় হোম করিলে, আপনি কিরূপ কল্যাণ লাভ করিতে পারেন?"

কমলাকান্ত—"কিরূপ কল্যাণ লাভ করিতে পারি, তাহা যদি আপনি দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি দেখাইতে পারি।"

মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, কমলাকান্তকে বিচলিত দর্শন করিয়া, ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না। ভেল্কী প্রদর্শন করাইয়া প্রবীন পুরুষের নিকটে, কেহ কখনো সাধকের সম্মান লাভ করিতে পারে না। প্রতাপচন্দের অধঃপতনের একমাত্র হেতুই আপনি ভাবিয়াছিলাম, আপনি সাধক, মহাপুরুষ, আপনার সঙ্গগুণে পুত্র উন্নতির পথে গমন করিবে, মানুষ হইয়া দেবতার আসনে উপবেশন করিবে, কিন্তু ফলে তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে। আপনার জন্য যত অর্থনাশ করিয়াছি, এবং আপনার প্রতি যত যত্ন সমাদর প্রদর্শন করিয়াছি, আপনি তাহার সমুচিত প্রতিদান প্রদান করিয়াছেন। আপনার কোন অপরাধ নাই। আমিই ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম।"

কমলাকান্ত স্বাভাবিক নম্রতা আশ্রয় করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ!

যে যেমন সংসর্গে থাকে, সে তেমনই হয়, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম ; এ নিয়ম কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। আমার মত বাজীকরের সঙ্গে প্রতাপচন্দ ভেল্কী ভিন্ন আর কি শিক্ষা করিবে ? আর আপনি যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, ইহাতেই বা আশ্চর্য্য কি ? কত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি সেই ভ্রান্তিরূপিণীর হস্তে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু একটী বিষয় স্থির জানিবেন, অহঙ্কারের অপরাধ অমার্জ্জনীয়।"

মহারাজা বাহাদুর আত্ম সম্বরণ করিলেন। নির্ভীক ধীর কমলাকান্তের বাক্যাবলি তাঁহার অন্তরে তরঙ্গের মত অভিঘাত করিল। নয়ন মুদ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ নীরবে অবস্থান করিলেন। অন্তরে সহসা প্রসন্নতার উদয় হইল। তিনি চিন্তাবশে প্রতাপচন্দের যোগৈশ্বর্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন ; দেখিলেন, "প্রতাপচন্দ ভীষ্মের মত ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী। প্রতাপ রাজকুমার হইয়াও নির্ম্মুক্ত যোগীশ্বর, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। যে ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মভাবে তন্ময়, যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মায়ামুক্ত, তাহাকে সংসারী করা অসম্ভব। প্রতাপ ত নির্ব্বোধ নয় ; অথচ বিষয়কর্ম্মে উদাসীন। ইহা তাহার অধঃপতন কি উন্নতি, তাহা কে নির্ণয় করিবে। এই সমস্তই সেই মহামায়ার বিধান।"

মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ বাহাদুর আবার কমলাকান্তের সঙ্গে স্বাভাবিক অনুরাগপূর্ণ বচনে সদালাপ আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে কমলাকান্ত বিদায় গ্রহণ করিয়া কোটালহাটে সাধনাসনে গমন করিলেন।*

ছোট মহারাজ প্রতাপচন্দ ইষ্টদেবের এই সকল বিড়ম্বনার বিষয় অবগত হইলেন এবং আপনাকেই ইহার নিমিত্ত জ্ঞান করিলেন। তিনি তাঁহার পরমারাধ্য ইষ্টদেবের অসম্মানে এবং অন্যান্য কারণে মর্ম্মাহত হইয়া যোগবলে দেহত্যাগ করিতে অথবা দেশত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইতে মনস্থ করিলেন। তিনি তাঁহার একমাত্র প্রিয়তম ইষ্টদেব কমলাকান্তের আশ্রমে আসিলেন, এবং যথারীতি চরণ বন্দনা করিয়া শেষ বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

মহাপুরুষগণ আপন হাতে আপনার শিরঃশ্ছেদন করিতে পারেন, পুত্র কলত্রাদির শোক যন্ত্রণা হাসিভরা মুখে সহ্য করিতে পারেন, দৈবদুর্ব্বিপাকের মধ্যে পতিত হইয়া আত্মপ্রসন্নতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, কিন্তু প্রাণপ্রিয়তম শিষ্যের বিয়োগ ভার সহ্য করিতে পারেন না। ছোট মহারাজ প্রতাপচন্দ

* প্রতাপচন্দের জীবনী আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এইজন্য তাঁহার জীবনের যে সমস্ত ঘটনা কমলাকান্তের সঙ্গে সম্বন্ধ কেবলমাত্র সংক্ষেপে তাহাই উল্লিখিত হইল।

চরমোচিত সম্ভাষণ করিয়া আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন। কমলাকান্ত তাঁহার বিয়োগে অধীর হইয়া অন্যান্যের সঙ্গে বাক্যালাপ পরিত্যাগ করিয়া, স্নেহময়ী জগজ্জননীর শ্রীচরণকমলে মস্তক রাখিয়া, নীরব সাধনায় নিযুক্ত হইলেন।

ছোট মহারাজ প্রতাপচন্দ্র কালনায় আসিয়া যোগবলে নিরুদ্দেশ হইলেন। তাঁহার নিরুদ্দেশে মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর কিছুকাল শোকবিহ্বল রহিলেন। সন্তানের যোগৈশ্বর্য্য তিনি অবগত ছিলেন; তাই সর্ব্বদা বলিতেন, "প্রতাপ আবার ফিরিয়া আসিবে, সে জীবিত আছে।"

কালে সত্য যথাস্থানে স্থাপিত হইল। মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর কমলাকান্তের প্রতি আবার শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেন। সংসারের নশ্বরত্ব, মানব জীবনের পরাধীনত্ব, এবং ভগবানের সর্ব্বোপরি কর্তৃত্ব ও সাধনতত্ত্ব, আবার তিনি কমলাকান্তের সঙ্গে বসিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। কমলাকান্তের কালী মণ্ডপে প্রত্যহ একবার উপস্থিত হওয়া মহারাজাধিরাজের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইল। সাধকাগ্রগণ্য দেওয়ান রঘুনাথ মহাশয় কমলাকান্তের শ্রবণ-কীর্ত্তনানন্দের একজন উত্তম সঙ্গী হইলেন। কিছুকাল পরমানন্দে অতীত হইল।

কমলাকান্ত দুইবার দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। শেষ বিবাহ কাঞ্চনপুরে করিয়াছিলেন। প্রথমা পত্নী অল্প বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত একটী কন্যাসন্তান জীবিতা ছিল। যাহা হউক সহসা কমলাকান্তের দ্বিতীয়া পত্নীও লোকান্তরে গমন করিলেন।

মহাপুরুষগণের অভিনয় শেষ হইলে আর তাঁহারা এ সংসারের রঙ্গমঞ্চে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন না। যেমন তাঁহাদের অভিনয় শেষ হয়, এবং যেমন তাঁহাদের পুণ্যলোকে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় হয়, অমনি তাঁহাদের লীলা-খেলার সঙ্গিগণেরও তিরোভাব ঘটিতে আরম্ভ করে। কমলাকান্তেরও তাহাই ঘটিতে লাগিল। প্রথমে ছোট মহারাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর অন্তর্হিত হইলেন, তাহার কয়েক বৎসর পরেই তাঁহার সহধর্ম্মিণীর তিরোভাব ঘটিল।

দামোদর নদের বিস্তৃত সৈকতে তাঁহার অগণ্য শিষ্য ও ভক্তগণ মহামহোৎসবে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর পরিত্যক্ত দেহ স্কন্ধে করিয়া বহন করিলেন এবং শ্মশানে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিতা সজ্জীভূত করিয়া তাহার উপরে সেই পুণ্যবতীর পবিত্র দেহ স্থাপন করিলেন। চিতার অনল প্রজ্বলিত হইল; সেই অনলে, কমলাকান্তের সাধনার সঙ্গিনীর সুসংস্কৃত কলেবর, বাষ্পে পরিণত হইয়া, উচ্চগগনের উচ্চপথে পরলোকের উদ্দেশে প্রবাহিত হইল।

অচঞ্চল কমলাকান্ত অচলের মত ধীরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, ধীর নয়নে সেই চিতার অভিনয় দর্শন করিতে লাগিলেন। যখন মহাযজ্ঞের মহাবহ্নি নির্ব্বাপিত হইল, ভক্তি-জগতের আদর্শ সাধক, তখন নিশ্চিন্ত চিত্তে, অত্যুচ্চ-কণ্ঠে, দামোদরের বিস্তৃত সৈকতের সঙ্গে গগনমণ্ডল শব্দায়মান করিয়া, জগজ্জননীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন।

"কালী সব ঘুচালি লেঠা।
এখন, শিবের লিখন আছে যাহা মান্‌বি কিনা মান্‌বি সেটা॥
যার প্রতি তোর কৃপা হয় মা, তার সৃষ্টিছাড়া রূপের ছটা।
তার, কটীতে কৌপিন মেলে না, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা॥
শ্মশান পেলে ভাল বাসিস, তুচ্ছ বাসিস মণি কোটা।
আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচলনা তাই সিদ্ধি ঘোঁটা॥
এ সংসারে এনে আমায় কর্‌লি এবার লোহা পেটা।
তবু যে মা বলে ডাকি সাবাশ আমার বুকের পাটা॥
জগৎ জুড়ে নাম রটেছে কমলাকান্ত কালীর বেটা।
কিন্তু, মায়ে পোয়ে এমন ব্যভার, ইহার মর্ম্ম বুঝ্‌বে কেটা॥"

পত্নী বিয়োগের পরে কমলাকান্তের অন্তঃকরণে কাশীবাসের বাসনা হইলে, মহারাজাধিরাজ তাঁহার জন্য পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধামে, এক বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়া, তাঁহাকে সেখানে যাইতে অনুরোধ করেন। মহারাজাধিরাজ বাহাদুরও কিছুকাল তাঁহার সঙ্গে, কাশীধামে বাস করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু কমলাকান্ত তখন তাঁহাতে অনভিমত প্রকাশ করিয়া, বলিতে লাগিলেন, "আর অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা হয় না। জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টী এখানেই মার চরণতলে পড়িয়া থাকিব।"

আর একবার কিছুদিন পরে দেশে অর্দ্ধোদয় যোগ উপস্থিত হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ বাহাদুর, সাধককুলভূষণ কমলাকান্তকে সঙ্গে করিয়া, গঙ্গাস্নানে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। মহারাজাধিরাজের সংকল্প কমলাকান্তকে অবগত করান হইলে, তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন, এবং তদনুসারে উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইল। "মহারাজাধিরাজের সঙ্গে কমলাকান্ত গঙ্গাস্নানে যাইবেন," শ্রবণ করিয়া সহস্র সহস্র লোক তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিতে

উদ্যোগী হইল। কিন্তু যাত্রাকালে কমলাকান্ত মহারাজ বাহাদুরকে বলিলেন, "আপনারাই গমন করুন। মাকে ফেলিয়া অন্য কোন স্থানে গমন করিতে আর আমার ইচ্ছা করে না।"

পূর্ব্বে "যাইব" বলিয়া, সময়কালে না যাওয়ায়, মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অন্তর কিছু বিচলিত হইল। তিনি দেওয়ান রঘুনাথ মহাশয়কে বলিলেন, "একে বৃদ্ধকাল তাহাতে পত্নীবিয়োগের পর হইতেই ঠাকুরের কিছু মাথার গোল ঘটিয়াছে। তিনি কখন্ কি বলেন তাহা ঠিক থাকে না। এই অর্দ্ধোদয় যোগ তাঁহার জীবনে আর তিনি দেখিবেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে!" মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর অন্যান্য অনুচরবর্গ ও অগণ্য গ্রাম্যযাত্রী সঙ্গে করিয়া কালনায় গমন করিলেন, এবং যথাবিধানে গঙ্গাস্নান করিয়া, বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিলেন।

সাধককুলতিলক কমলাকান্তের শেষদিন নিকটবর্ত্তী হইল। বহু স্থান হইতে তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণ তাঁহার সাধনাসনে আগমন করিতে লাগিলেন। কমলাকান্ত এখন জীবন্মুক্ত পুরুষের মত উদাসীন ভাবাপন্ন;—আপন পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিহীন, ভোজনে শয়নে জ্ঞানহীন; কেহ কোন প্রশ্ন করিলে প্রকৃষ্ট উত্তর প্রাপ্ত হয় না। কেবলমাত্র জগদ্ধাত্রীর গুণকীর্ত্তনে ভ্রান্তি নাই, অবসর নাই। "জয়কালী, জয়কালী" বলিয়া আপন মনে কখনো হাস্য করেন, কখনো রোদন করেন, কখনো বা নৃত্য করেন, এবং কখনো অব্যক্ত শব্দ করেন। কালী প্রতিমার সম্মুখে উপবেশন করিয়া, কমলাকান্ত আপন মনে কত কথা বলেন; কখনো শিশুর মত উলঙ্গ হইয়া প্রতিমার সম্মুখ দিয়া গমনাগমন করেন। একমাত্র জগজ্জননীর শ্রীচরণকমল ভিন্ন দিব্য ভাবে উন্মত্ত কমলাকান্তের আর অন্য দিকে লক্ষ্য নাই। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সম্মুখে আসিয়া, দণ্ডায়মান হইলেও আর তাঁহার প্রতি লক্ষ্য নাই। কমলাকান্তের সাধনাসনে এখন যাঁহারা উপস্থিত হন, তাঁহারা সাধকের দিব্যোন্মত্ততা দর্শন করিয়া, ভাবে আত্মহারা হইয়া গমন করেন।

সহসা একদিন প্রকৃতিস্থ হইয়া মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে দর্শন করিতে কমলাকান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজপ্রাসাদে তৎক্ষণাৎ লোক প্রেরিত হইল, এবং যথাসময়ে মহারাজাধিরাজ তাঁহার মণ্ডপের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কমলাকান্ত বলিলেন, "এখানে থাকিতে আমার আর ইচ্ছা করে না। মার কাছে যাইতে ইচ্ছা করে। আমি কাল প্রাতঃকালে মার কাছে যাত্রা করিব।"

মহারাজাধিরাজ মনে করিলেন "কমলাকান্তের কাশীধামে যাওয়ার ইচ্ছা হইয়াছে। তাই উত্তর করিলেন, "বহুদিন পূর্ব্বেই ত পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধামে আপনার জন্য বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছি। আপনার যখন ইচ্ছা তখনই সেখানে যাইতে পারেন।"

এমন সময় দেওয়ান রঘুনাথ মহাশয় তথায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত শ্রবণ করিলেন। সাধকের হৃদয় সাধকের অনুভবনীয়। তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে বলিলেন, "মহারাজ! এই যাত্রা কাশীযাত্রা নহে। ইহা সংসারযাত্রার উপসংহার করিয়া মহাপথের মহাযাত্রা। রাজরাজেশ্বরী জগদ্ধাত্রীর গরীষ্ঠ সন্তান বর্দ্ধমান সন্তানশূন্য করিয়া, কাল প্রাতঃকালে সেই আনন্দময়ীর আনন্দ-নিকেতনে গমন করিবেন। আমাদের সঙ্গে মহাপুরুষের এই শেষ সম্ভাষণ।"

বৃদ্ধ মহারাজাধিরাজ বাহাদুর দেওয়ান রঘুনাথ মহাশয়ের কথা ধীরভাবে শ্রবণ করিলেন, স্থিরভাবে ধীর নয়নে কমলাকান্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে জগজ্জননীর মন্দিরে প্রণাম করিয়া, নীরবে, চিন্তাকুলচিত্তে আপন প্রাসাদে গমন করিলেন।

রজনীর অন্ধকার বিদূরিত হইল। সহস্র লোক মহাপুরুষের অবসান দর্শন করিতে কোটালহাটে উপস্থিত হইল। করুণহৃদয় মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর ও দেওয়ান রঘুনাথ মহাশয়, অনুচরবর্গ সঙ্গে করিয়া কমলাকান্তের সাধন-আসনে উপস্থিত হইলেন। মণ্ডপের প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হইল।

কমলাকান্ত প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া, প্রতিমার সম্মুখে উপবেশন করিলেন। "জয়মা" বলিয়া জবা বিল্বদলে করপূর্ণ অঞ্জলি, জগজ্জননীর শ্রীচরণকমলে, নয়নজলে বক্ষস্থল প্লাবিত করিয়া, অর্পণ করিলেন। শেষে জগজ্জননীর করুণা-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। জীবনের শেষ সঙ্কীর্ত্তনের পরিসমাপ্তি হইল। শেষে প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গ নির্নিমিষনয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। আবার নয়নজলে বদনমণ্ডল প্লাবিত করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"কিছু নাই সংসারের মাঝে কেবল শ্যামা সার রে।
আমার ধন কালী, মন কালী, প্রাণ কালী আমার রে॥
এ তিন ভুবনে, এ তনু ধারণে, যাতনা নাহিক কার রে।
মায়ের হেরিলে শ্রীমুখ, দূরে যায় দুখ, ঐ গুণ শ্যামা মার রে॥

কেহ, সংসারে আসিয়ে, বড় সুখে আছে, পাইয়ে রাজ্যভার রে।
আমার, দরিদ্রের ধন, ওরাঙাচরণ, হৃদয়ে করেছি হার রে॥
কমলাকান্ত, হইয়ে ভ্রান্ত, ভ্রমিতেছ বারে বার রে।
মায়ের অভয় চরণ, কররে স্মরণ, অনায়াসে হবি পার রে॥

কমলাকান্ত কীর্ত্তনের পরে অবসন্ন হইয়া, জগজ্জননীর চরণতলস্থ পূর্ণকুম্ভের সন্নিধানে শয়ন করিলেন। সুনির্গুণযোগভক্তের পূর্ণভক্তির পূর্ণতরঙ্গে, সমাগত জনসঙ্ঘ সুচঞ্চল হইয়া উঠিল। বিষন্নমনে, অনিমিষ নয়নে, সকলে কমলাকান্তকে দর্শন করিতে লাগিলেন। মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ বাহাদুর ও দেওয়ান রঘুনাথ মহাশয়ের প্রতি, কমলাকান্ত নীরবে, স্থিরনয়নে, একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই নীরব দর্শনে অন্তর্জ্জগতের অতি বিস্তৃত কথোপকথন সম্পন্ন হইয়া গেল।

মহাপুরুষের কলেবর ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। ক্ষীণকণ্ঠে, কমলাকান্ত একবার আপন মনে বলিলেন, "জল খাব।" তখন মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ব্যস্ত হইয়া জল আনিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সহস্র হস্ত "জল, জল" বলিয়া উত্থিত হইল। কিন্তু জগজ্জননীর পাদপদ্মে একান্ত নির্ভরশীল, ভাগবতোত্তম, সাধকের পিপাসা দূর করিতে, পতিতপাবনী করুণাময়ী সুরধুনী ধারারূপে, পূর্ণকুম্ভের নিকট হইতে উত্থিত হইয়া, তাঁহার বদনকমলে পতিতা হইলেন। তাঁহার তৃষ্ণা নিবারিত হইল। তিনি "জয়মা করুণাময়ী কালী" বলিয়া নয়নকমল চিরকালের তরে মুদ্রিত করিলেন।

অদৃষ্টপূর্ব্ব অসম্ভব ঘটনা সম্ভব করিয়া, শক্তি-সাধনার গৌরবের নিশান উড্ডীয়মান করিয়া, এবং সাধনবিভূতিদ্বারা বিপুল জনসঙ্ঘকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া, কমলাকান্ত পুণ্যলোকে গমন করিলেন। তখন মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ বাহাদুরের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। গঙ্গা যাঁহার নিত্য সঙ্গিনী, অর্দ্ধোদয় যোগের গঙ্গাস্নানে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, এ কথা তখন সকলে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। শোকসন্তপ্ত দর্শকমণ্ডলী "হাহা প্রভো কমলাকান্ত" বলিয়া, আর্ত্ত-নাদে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। শেষে দামোদরের পবিত্র সৈকতে, সাধককুলতিলক কমলাকান্তের পুণ্যময় কলেবর, সুসজ্জিত চিতায় আরোহণ করিয়া, জগন্মঙ্গলকর হুতাশনদেবের সহিত, সর্ব্বোন্নত গগনপথে, মুক্তিলোকে গমন করিল। সাধকাগ্রগণ্য দেওয়ান রঘুনাথ মহাশয় কমলাকান্তের শোকে, "আজ হইতে সাধুসঙ্গ লাভে বঞ্চিত হইলাম" বলিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

কমলগতপ্রাণ, গুণগ্রাহী বৃদ্ধ মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ বাহাদুর, সজলনয়নে বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া, শোকাবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "হা কমলাকান্ত! হা প্রতাপচন্দ!!"

উপসংহার।

সাধককুলতিলক কমলাকান্তের জীবনী সংগ্রহ করিতে, আমি ১৩২১ সালের ৯ই ভাদ্র বর্দ্ধমানে গমন করিয়াছিলাম। কোটালহাটে কমলাকান্তের সাধনাসনে প্রথমে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সেখান হইতে বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ মহাতাব বাহাদুরের, স্বধর্ম্মানুরাগ ও বহুগুণের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ প্রকাশ করিয়া, তাঁহার উইলবাড়ীতে আমাকে পঁচিশ দিন রাখিয়াছিলেন। এবং কমলাকান্তের জীবনী সংগ্রহের জন্য আমি চান্না, কাঞ্চনপুর প্রভৃতি যতস্থানে যাইতে প্রয়োজন-বোধ করিয়াছিলাম, সমস্ত স্থানে লোকজন, ও একজন সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বাবু যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে দিয়া, পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া, এবং কমলাকান্তের লীলাক্ষেত্র সমূহ দর্শন করিয়া, যতদূর সাধ্য সত্যের অনুসরণ করিয়াছি। বর্দ্ধমান সাহিত্যপরিষতে এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সাহিত্যানুরাগী, প্রাচীন তত্ত্বাবিষ্কারে পরমোৎসাহী, পরমভাগবত, মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ মহাতাব বাহাদুর, কমলাকান্তের এই জীবনী শ্রবণ করিয়া অনুমোদন করিলে ইহা এই সদ্ভাবতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছি।

খাঁকী বাবা, ভবানীপুরের হরানন্দ সরস্বতী এবং ডাবুকেশ্বরের কৈলাসপতি বাবার নিকট কমলাকান্ত সম্বন্ধে অনেক বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলাম। কৈলাসপতি বাবা ১৬০ বৎসরে দেহত্যাগ করেন। খাঁকী বাবা ১৫২ বৎসরে দেহত্যাগ করেন। পণ্ডিতকুলতিলক হরানন্দ সরস্বতী ৮০ বৎসরে দেহত্যাগ করেন। এই সকল মহাপুরুষেরা তান্ত্রিক সাধনগগনের অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা স্বজাতীয় সিদ্ধ মহাপুরুষগণের সংবাদ যাহা জানিতেন, তাহা অন্যত্র প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা সাধনতত্ত্ব আলোচনা করেন, সাধকের

জীবন যাপন করেন, এবং ভক্ত সাধকগণের জীবনী শ্রবণ-কীর্ত্তন যাঁহাদের সাধনার অঙ্গ, সাধনতত্ত্ব ও সাধকের সংবাদ তাঁহাদের নিকটেই শ্রবণীয়।

ভক্তকুলগৌরব কমলাকান্তের বিবরণ অবগত হইবার জন্য, আমরা বিশালাক্ষীর মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া, গ্রামের প্রাচীন অধিবাসিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বসতির দিকে গমন করিলাম। ময়দানের মধ্যে এক অশীতিপর বৃদ্ধাকে প্রথমেই দর্শন করিলাম। তাঁহার নাম মাতঙ্গিনী দেবী। তাঁহার স্বামীর নাম নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলিলেন, "আমার বাল্যকালের সমস্ত ঘটনা স্মরণ হয় না; বউকালে সকলের মুখে কমলাকান্তের কথা শুনিতাম; তিনি মুখুয্যেদের দৌহিত্র ছিলেন। তিনি বড় পণ্ডিত ছিলেন। ঐ শিমূলতলায় তাঁহার পঞ্চমুণ্ডের আসন; ঐ বিশালাক্ষীর মন্দিরে তিনি সাধনা করিতেন। মা বিশালাক্ষী তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন; নারী বাগ্দী হইয়া তাঁহাকে মাছ দিয়াছিলেন। তাঁহার একটী কন্যা ছিল।"

পণ্ডিত রামেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আমরা বাল্যাবধি শুনিয়া আসিতেছি কমলাকান্ত মুখুয্যেদের দৌহিত্র ছিলেন; শিমূলতলার আসনে তিনি সাধনা করিতেন; ঐ স্থানে মা জগদম্বা তাঁহাকে ধীবরকন্যারূপে দর্শন দিয়াছিলেন। ধর্ম্মনারায়ণের নাম শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। একটী বিধবারূপে তাঁহার নিকটে গান শুনিয়াছিলেন একথা শুনিয়াছি। ওড়গ্রামের ডাঙ্গায় একবার দস্যুগণ তাঁহার জিনিস-পত্র লুণ্ঠন করে, এবং তাঁহার গান শুনিয়া সমস্ত তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করে। শেষে দস্যুগণ দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ঐ স্থানকে কমলাকান্তের টোলবাড়ী বলে। মহারাজা তেজচন্দ বাহাদুর তাঁহাকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি কোটালহাটে যাইয়া আশ্রম করেন। সেখানে তিনি দেহত্যাগ করেন। এই প্রবাদ আছে, তাঁহার মরণ সময়ে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া গঙ্গা উঠিয়া তাঁহার তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আমার গৃহে কমলাকান্তের হস্তলিখিত বহু গ্রন্থ ছিল। তন্মধ্যে "সাধন পঞ্চকে" 'কমলাকান্ত শর্ম্মণঃ' নাম স্বাক্ষরিত ছিল। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁহার একটী ছাত্র দ্বারা সেই "সাধন পঞ্চক" সাহিত্য পারিষদের জন্য লইয়া গিয়াছেন। গ্রন্থখানি প্রত্যর্পন করিবার কথা ছিল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহা করেন নাই। চান্নায় সেকালে অনেক টোল ছিল, কমলাকান্ত সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি

মুখুয্যেদের দৌহিত্র ছিলেন। তাঁহাদের বাড়ীর মধ্যেই তাঁহার বাড়ী ছিল। মা বিশালাক্ষীর মন্দিরে তিনি সাধনা করিতেন। শিমূলতলায় তাঁহার পঞ্চমুণ্ডের আসন। নারীবাগ্দী রূপ ধরিয়া মা তাঁহাকে মাছ দিয়াছিলেন। বিধবা রমণীর বেশে জগজ্জননী তাঁহার গান শুনিয়াছিলেন। মহারাজা তেজচন্দ তাঁহার সহায় ছিলেন। কোটালহাটে তিনি দেহত্যাগ করেন। ইত্যাদি"

মুখুয্যে পাড়ার শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—"আমার বয়স আশীবৎসর পার হইয়াছে। আমার পিতামহ ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কমলাকান্তের বন্ধুত্ব ছিল। আমার পিতামহকে আমি দেখিয়াছি। বাল্যকালের কথা ভাল স্মরণ নাই। কমলাকান্ত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন—পদকর্ত্তা ছিলেন; আমার ঠাকুরদাদা বড় গায়ক ছিলেন। "তিনি গান রচনা করিতেন, আমার পিতামহ গান করিতেন।" অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন "ঐখানে কমলাকান্তের বাড়ী ছিল। তাঁহার একটী কন্যা জীবিত ছিল। শিমূলতলার আসনে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। কাঞ্চনপুরে শেষ বিবাহ করেন। তিনি বিশালাক্ষীর দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। কোটালহাটে দেহত্যাগ করেন।" বৃদ্ধ অনেক কথা বলিলেন কিন্তু কমলাকান্ত যে তাঁহাদের ঘরের দৌহিত্র ছিলেন একথা কিছুতে স্বীকার করিলেন না। তাঁহার ভয় পাছে কমলাকান্তের কোন উত্তরাধিকারী আসিয়া সম্পত্তির অংশ দাবী করে।

চান্নার যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশালাক্ষীর মন্দিরের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে নদীর তীরে এক আশ্রম করিয়াছেন। স্বামী-স্ত্রী একত্রে ভৈরব ভৈরবীর মত সেখানে বাস করেন। তিনি উচ্চশিক্ষিত এবং প্রবীণত্বে অলঙ্কৃত। তাঁহার সাধনা আছে এবং সাধকের প্রতিভা জন্মিয়াছে। তিনি নিরালম্বস্বামী নাম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারি বৃদ্ধা মাতা বলিলেন, "তিনি বউকাল হইতে শুনিয়াছেন, কমলাকান্ত মুখুয্যেদের দৌহিত্র। কমলাকান্ত দু'বার বিবাহ করেন। শেষ বিবাহ কাঞ্চনপুরে করেন। তাঁহার কন্যা ছিল। সে মারা গিয়াছে। থাকিলে তাঁহার কাছে সব শুনিতে পারিতেন। মা তাঁহার কাছে গান শুনিতেন। তিনি মাকে দর্শন করিয়াছিলেন। কোটালহাটে দেহত্যাগ করেন।" ইত্যাদি।

অবধূতকুলতিলক হরানন্দ সরস্বতী বলিয়াছিলেন, "আমার বয়ঃক্রম এখন ৮৫ বৎসর। আমার জন্মস্থান কোটালহাট লাকুড্ডী। আমি বাল্যকালে সর্ব্বদা মার সঙ্গে কমলাকান্তের সাধনাসনে যাইতাম। আমি কালীপদ

তর্কবাগীশকে দেখিয়াছিলাম। তিনি কমলাকান্তের প্রধান একজন শিষ্য ছিলেন। কমলাকান্ত কৌল ছিলেন। প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন। তিনি *** নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। কমলাকান্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অণিমালঘিমায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। জগজ্জননী কালী ধর্ম্মেরও মা, নারায়ণেরও মা। তাই ধর্ম্ম-নারায়ণের মা সাজিয়া কমলাকান্তের নিকটে গান শুনিয়াছিলেন। চান্নায় তাঁহার জন্মস্থান;— বিশালাক্ষীর মন্দিরে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। নারীবাগ্দীরূপে কমলাকান্তকে বিশালাক্ষী মাছ দিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছামৃত্যু মরিয়াছিলেন। আমিও মরিব। কৌলগণ সর্ব্বদাই সকলকে বলিয়া কহিয়া দেহত্যাগ করেন। খাঁকী বাবা ও কৈলাসপতি উভয়েই বয়সে আমার অনেক বড়। তাঁহাদের সাধনার বিষয় জানি না। কমলাকান্তের মহাযাত্রাকালে মা গঙ্গা দর্শন দিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছিলেন। অগণ্য লোকে তাহা দেখিয়াছিল। কমলা-কান্তের বাড়ীর সম্মুখে কেহ বাড়ী করিয়া বাস করিতে পারে না। আমি আঠার বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করি।" ইত্যাদি।

খাঁকীবাবাও এইরূপ বলিয়াছিলেন। তিনি বহুবার বর্দ্ধমানে গিয়াছিলেন। সকলেরই প্রায় এক প্রকার কথা। সমস্ত লেখা নিষ্প্রয়োজন।

কয়ড়ার কালীবাড়ী।

যে সুদীর্ঘ রাজপথ ফরিদপুর হইতে বাহির হইয়া, পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়াছে, তাহার ষোল মাইল অতিক্রম করিলে, সাধককুলশিরোমণি কামদেব তার্কিকের শেষ জীবনের বাসস্থান মহিশালা প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহিশালা হইতে মাত্র এক মাইল পূর্ব্বদিকে কুমার নদের তীরে কয়ড়ার কালীবাড়ী। এই কালীবাড়ী সেই অঞ্চলের তীর্থক্ষেত্ররূপে বহুকাল বিরাজিত। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে অবধূতকুলতিলক কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী নামে কোন মহাপুরুষকর্ত্তৃক এই কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

রাজা সীতারামের সময়ে এইস্থানে সাধককুলগৌরব কামদেব ও যাদবেন্দ্র

(যাদবানন্দ অবধূত) সাধনা করেন। তাঁহাদের পরে রামচন্দ্র ও শ্যামচন্দ্র, (সাধারণে যাঁহারা রামা-শ্যামা ডাকাত নামে পরিচিত) সাধনা করেন। তাঁহাদের পরে দেবানন্দ অবধূত এইস্থানে সাধনা করেন। রাণী ভবানীর সাময়িক, বৈষ্ণব-জগতের সমুজ্জ্বল রত্ন রামদাস সাধু এইস্থানে গুরুলাভে কৃতার্থ হইয়া অণিমা-লঘিমা সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কত মহাপুরুষ কত সময়ে এইস্থানে সাধনা করিয়া পরমার্থলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা কোনও প্রকারে সাধ্যায়ত্ত নহে।

সিদ্ধ মহাপুরুষগণের সাধনাসন বলিয়া কয়ড়ার কালীবাড়ী দর্শন করিতে, বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে, পর্ব্ব উপলক্ষ্যে, বহুযাত্রী আগমন করিয়া থাকেন। মাঘীয় পূর্ণিমায় ও বৈশাখী সংক্রান্তিতে এইস্থানে বহুভক্তের সমাগম হইয়া থাকে। আজ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমুসলমানগণ ভেদ-বুদ্ধি-শূন্য হইয়া, সংশয়শূন্যচিত্তে, অনন্ত ভক্তির সহিত, জগজ্জননীর মন্দিরে পূজোপকরণ প্রেরণ করিয়া থাকেন।

সর্ব্বোপরি নিয়ন্তা কালের পরিবর্ত্তনের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে, স্থাবর জঙ্গম কাহারও সামর্থ্য নাই। যুগে যুগে বিপ্লবপীড়িত,—সংক্রামক রোগ-সমূহে উৎসাদিত, স্থানের, এবং ক্রমশঃ অধঃপতিত আত্মবিস্মৃত জাতির, প্রাচীন কীর্ত্তিকথা মাত্র জনপ্রবাদের উপরে নির্ভর করে। প্রভূত সমৃদ্ধি-সম্পন্ন অগণ্য জনপরিপূর্ণ ভূষণা এখন ভয়ঙ্কর জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন; এবং তাহার দুইশত বৎসর পূর্ব্বের পরিচয় এখন কল্পিত উপন্যাসের মত অনুমান হয়। মাত্র ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা ভূষণা দর্শন করিয়াছিলেন, যে সকল মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইয়াছিলেন, আজ ত্রিশ বৎসর পরে যদি তাঁহারা আবার ভূষণায় গমন করেন, দেখিবেন, "ভূষণা নূতন আকার ধারণ করিয়াছে।" কয়ড়ার কালীবাড়ী এই ভূষণার অন্তর্গত ছিল। ভূষণার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তর্গত সমস্ত গ্রামের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

১২৭০ সালের পৌষ-সংক্রান্তিতে কয়ড়ার জঙ্গলাচ্ছন্ন নির্জ্জন কালীবাড়ীতে এক নরবলি হইয়াছিল। ঢাকা, ফরিদপুর, যশোহর, বরিশাল হইতে নৌকা-পথে বহু যাত্রী এইস্থানে তখন সমাগত হইত। নির্জ্জন প্রাঙ্গণে নিশীথ রাত্রে কোন্ স্থান হইতে, কোন্ যাত্রী আসিয়া, এই ভয়ঙ্কর নৃশংস কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছিল, বহু অনুসন্ধানেও কেহ তাহার বিবরণ জানিতে সমর্থ হয় নাই। সেই সময় হইতে এই কালীবাড়ীর প্রতি, যেমন জনসাধারণের, তেমন গবর্ণমেণ্টের, বিশেষ দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল।

আজ পর্য্যন্ত এই স্থানে যাঁহারা ভক্তিযুক্ত অন্তরে জগজ্জননীর অর্চ্চনা করিতে আগমন করেন, তাঁহারা বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্থানে ছাগবলি প্রদত্ত হয়। আমার সাক্ষাতে একদিন একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমি অন্যান্য অগণ্য দর্শকমণ্ডলীর সঙ্গে তাহাতে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলাম।

কয়ড়ার অনতিদূরবর্ত্তী "ষাপুর" হইতে অক্ষয়সাহা নামে এক ব্যক্তি একটী ছাগ লইয়া মা কালীর পূজা প্রদান করিতে আসিয়াছিল। অক্ষয়সাহা পূর্ব্বে এক ফৌজদারী মোকদ্দমায় পতিত হইয়া, মা কালীর নিকটে ছাগবলি প্রদান করিয়া পূজা দিতে মানস করিয়াছিল, এবং মোকদ্দমায় মুক্তিলাভ করিয়া বহুদিন আলস্যে ও ঔদাস্যে অতিবাহিত করিয়া শেষে পূজার উপকরণাদি লইয়া, কালী-বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিল। কৃপণ অক্ষয় কোন উপকরণই প্রশস্তচিত্তে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল না।

ছাগ বলিদানের সময় খড়্গাধারী (খাঁড়াত) এক প্রকাণ্ড তীক্ষ্ণধার খড়্গ ধরিয়া বলিদান স্থানে দণ্ডায়মান হইল। দুইজন বলবান যুবক ছাগটাকে টানিয়া ধরিল। খড়্গাধারী ক্রমান্বয়ে ছাগের ঘাড়ে ত্রিশবার খড়্গাঘাত করিল, খড়্গের মুখ বাঁকিয়া গেল, তথাপি সেই ছাগের একগাছা রোম পর্য্যন্ত কাটিল না। তখন সেই ছাগটাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ছাগটা অর্দ্ধমৃতাবস্থায় মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। সহসা একটা স্ত্রীলোক উন্মাদিনীর মত চীৎকার করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে মন্দিরের সম্মুখে উপবেশন করিল এবং দৈবভাবে আবিষ্ট হইয়া বিপুল জনসঙ্ঘের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া বলিতে লাগিল, "তুই জানিয়া শুনিয়া শৃগালের উচ্ছিষ্ট কেন আমার নামে উৎসর্গ করিতে আনিয়াছিস্?"

তখন সেই অক্ষয়সাহা আপন মুখে দোষ স্বীকার করিল। একটী পাঁঠার মূল্য তিন চারি টাকা। সে মাত্র একটাকা চারি আনা মূল্যে প্রাপ্ত হইয়া শৃগাল-ধরা পাঁঠা কিনিয়া আনিয়াছিল। যাহার পাঁঠা, সে অক্ষয়সাহাকে কিনিবার সময় সেকথা বলিয়াছিল। কৃপণ অক্ষয়সাহা অল্পমূল্যে পাইয়া আর ভালমন্দ বিচার করা আবশ্যক মনে করে নাই। আমরা সমস্ত শুনিয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়াছিলাম। অক্ষয়সাহা পর সপ্তাহে দশগুণ অর্থব্যয়ে জোড়া পাঁঠা দিয়া পূজা দিয়াছিল। মুজুরদিয়ার অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য ঐদিন পূজক ছিলেন। আমি

ছাগাদি বলিদানের পক্ষপাতী না হইলেও এই ঘটনায় বলিদানের বিশেষত্ব স্বীকার করিতে সেইদিন বাধ্য হইয়াছিলাম।

এইস্থানের মা কালীর নাম মুক্তিদায়িনী, আনন্দময়ী। বিপদ ও দুরারোগ্য রোগের হস্ত হইতে বহুলোক মুক্তিদায়িনীর নিকটে আসিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।

জীবানন্দ অবধূত ও রামা-শ্যামা।

রামচন্দ্র ও শ্যামচন্দ্র তখন "ডাকাইত রামা-শ্যামা" নামে ফরিদপুর ও যশোহর অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভীমের ন্যায় বলশালী ছিলেন এবং ধনশালীর অর্থ বলপূর্ব্বক লুণ্ঠন করিয়া দীনদরিদ্র লোকের সাহায্য করিতেন, জলাশয়শূন্য স্থানে জলাশয় খনন করিতেন, এবং এইরূপ কার্য্যকে পরমপুরুষার্থ মধ্যে গণ্য করিতেন। কৃপণ ধনশালিগণ তাঁহাদের ভয়ে সর্ব্বদা তটস্থ থাকিতেন এবং অভাবগ্রস্ত দীনদরিদ্রগণ তাঁহাদের নামে আনন্দিত হইত।

তাঁহারা একবার ভূষণার ধনী কমলেশ্বর রায়ের গৃহে উপনীত হইয়া দীন-দরিদ্রের সাহায্যের জন্য দশ হাজার টাকা প্রার্থনা করিলেন এবং ঐ টাকা প্রাপ্ত না হইলে তাঁহার ধনাগার লুণ্ঠন করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন। ধর্ম্ম-প্রাণ, ঈশ্বরে নির্ভরশীল, সাধুসজ্জনাশ্রিত কমলেশ্বর তাহাদের ধৃষ্টতা দর্শন করিয়া হাস্য করিলেন এবং বলিলেন, "যদি সেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছা হইয়া থাকে, আপনারা না করিলেও আমার ধনাগার লুণ্ঠিত হইবে। আপনারা ত নিমিত্ত মাত্র; এই সুবিশাল বিশ্বে সর্ব্বত্র কেবল সেই বিশ্বনাথের অভিনয়। যাহাহউক আপনারা আসন গ্রহণ করিয়া পথশ্রান্তি নাশ করুন, পরে যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন।"

কমলেশ্বর সাধু ও অভ্যাগত সেবায় পরমানন্দ লাভ করিতেন এবং প্রত্যহ তাঁহার গৃহে দশ বার মূর্ত্তি সাধুসন্ন্যাসী অবস্থান করিতেন। প্রত্যহ তাঁহার গৃহে শাস্ত্রালোচনা ও হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন হইত।

রামা-শ্যামার নাম এই অঞ্চলে তখন সমস্ত লোকের রসনায় ঝঙ্কারিত হইত। কমলেশ্বরের গৃহে যে সকল সাধুসন্ন্যাসী অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারা

রামা-শ্যামাকে দর্শন করিতে, বৈঠকখানায় আগমন করিলেন। রামা-শ্যামার বিরাটদেহ, তেজস্বীতাপূর্ণ মুখমণ্ডল, জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গকান্তি, নির্ভীকপ্রকৃতি, প্রভৃতি দর্শন করিয়া, এবং হৃদয়গ্রাহী যুক্তিপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া, সকলেই চমৎকৃত হইলেন। সাধুমণ্ডলীর মধ্য হইতে জীবানন্দ অবধূত অগ্রবর্ত্তী হইয়া কথা বলিতে লাগিলেন।—

জীবানন্দ—"তোমরা এইরূপে পরস্ব লুণ্ঠন করিয়া কি জন্য দেশকে অশান্তিময় করিতেছ?"

রামচন্দ্র—"আমরা ধনের সদ্ব্যবহার করিতেছি। কৃপণ অর্থরাশি আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আমরা তাহা লইয়া দরিদ্রদিগকে প্রতিপালন করিতেছি; ধনী অপরিমিত অর্থব্যয় করিতেছে, আমরা তাহাকে সংযত করিতেছি; যে পরিচ্ছদ এক টাকায় হয়, ধনী তাহার জন্য একশত টাকা খরচ করে, অথচ অগণ্য লোক অর্থাভাবে কাপড় পরিতে পায় না; আমরা ধনীর বিলাসিতা খর্ব্ব করিয়া দীনদরিদ্রের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতেছি।"

জীবানন্দ—"যদি তোমাদের উদ্দেশ্য দরিদ্রপালন অথবা পরোপকার হয়, তাহা হইলে পরস্ব লুণ্ঠন না করিয়া, নিজ নিজ উপার্জ্জিত অর্থে এই সদনুষ্ঠান কর না কেন?"

রামচন্দ্র—"আমাদের কোন স্বোপার্জ্জিত অর্থ নাই। আর এই হিতকার্যে রাশীকৃত অর্থের প্রয়োজন, তাহা উপার্জ্জন করিতে সময় সুবিধাও নাই।"

জীবানন্দ—"তোমরা উচ্চবংশোদ্ভব, কর্ম্মপটু ও মেধাবী। তোমরা বাণিজ্য দ্বারা অথবা রাজদ্বারে কর্ম্মচারী হইয়া, প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পার।

"এই পৃথিবীতে অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। তোমরা ন্যায়নীতি বিরুদ্ধাচারী হইয়া, নিষ্ঠুরের মত পরস্বলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়া, কি নিমিত্ত কলঙ্ক ভাগী হইতেছ? যাহারা অকর্ম্মা, যাহারা অলস, যাহারা নির্ব্বোধ, যাহারা মোহান্ধ এবং যাহারা ইতর-বুদ্ধি তাহারাই দুর্ভাগা দরিদ্র হয়,—দরিদ্র হইয়া নিজ নিজ স্বভাবের ফলভোগ করে। আর যাহারা সত্যবাদী সচ্চরিত্র, ও অনলস হইয়া কর্ম্মপটু, যাহারা পরগলগ্রহ হওয়াকে ঘৃণিত কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করে, যাহারা সময় ও শক্তির সদ্ব্যবহার জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করে তাহারা নিজ নিজ অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ধনশালী হয়। তোমরা পরিশ্রমীর সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া, অলস অকর্ম্মার সাহায্য করিতেছ—দেবতার গৃহ ধ্বংস করিয়া ভূতপ্রেতের গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছ; তোমরা তপস্যার গৌরব ধ্বংস করিয়া পাপের প্রশ্রয় প্রদান

করিতেছ। তোমরা শাস্ত্রবিগর্হিত কর্ম্মানুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া, প্রত্যক্ষভাবে দানবের ব্রত অবলম্বন করিয়াছ।

"আর এতদিন যে সকল দরিদ্রকে সাহায্য করিয়াছ, তাহাদের দারিদ্র্য কি বিদূরিত হইয়াছে? তাহারা কি এখন নিত্যনূতন সাহায্য না পাইলে স্বচ্ছন্দে গৃহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছে? মানুষ আপনার পায়ে ভর করিয়া আপুনি দাঁড়াইতে না পারিলে, কেহ হাত ধরিয়া দণ্ডায়মান রাখিতে পারেনা। কর্ম্ম-যোগাবলম্বনে, অক্লান্তপরিশ্রমে, আপন দারিদ্র্য দূর করিতে না পারিলে, কেবল বাহিরের সাহায্যে দারিদ্র্য দূরীভূত হয় না।

"যদি দরিদ্র বলিয়া প্রাণ কান্দিয়া থাকে, তাহা হইলে এই সকল ধনশালীকে ইহাদের পুণ্যের ফল, পরিশ্রমের পুরস্কার, হইতে বঞ্চিত করিয়া, দানবের ন্যায় বলপ্রয়োগে ইহাদিগকে দরিদ্র করিতেছ কি জন্য?—সময় ও ঈশ্বরপ্রদত্ত হস্ত-পদাদির শক্তির অপব্যবহার জন্য, সেই পরমেশ্বরের বিধানে যাহারা দরিদ্র হইয়াছে, তাহাদিগকেই ত তোমরা সাহায্য করিতেছ? কিন্তু যাহারা তোমাদের উৎপীড়নে পথের ভিখারী হইতেছে, তাহাদের সাহায্য কে করিবে? এক দরিদ্র প্রতিপালন জন্য অন্য দশজনকে আর দরিদ্র করিও না; গোহত্যা করিয়া চর্ম্মপাদুকা বিতরণ আর করিও না; অযোগ্যের জন্য যোগ্যের সর্ব্বনাশ আর করিও না; অপরাধীর জন্য নিরপরাধ সজ্জনগণকে আর দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিও না। তোমরা ধীমান, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, অথচ আত্মকর্ম্মের ফলাফল চিন্তায় কি জন্য উদাসীন রহিয়াছ?"

"দরিদ্রকে রক্ষা কর" ধর্ম্ম এ কথা বলিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু "দরিদ্র রক্ষা করিতে ধনীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহাকেও দরিদ্র কর" ধর্ম্ম এ কথা বলেন নাই। যে স্বাবলম্বনে নিজে নিজে দারিদ্র্যের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি-য়াছে তাহাকে আর দরিদ্র করিও না,—দরিদ্র রক্ষার ভাণ করিয়া রাক্ষস ধর্ম্ম প্রচার করিও না। মানুষ হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইয়া, সুখময় শান্তিপূর্ণ সংসারে আর যন্ত্রণার তরঙ্গ উত্থিত করিও না।"

অবধূতরাজ জীবানন্দের অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র ও শ্যামচন্দ্র নীরবে রহিলেন। শ্যামচন্দ্র বলিলেন, "তাইত এক দরিদ্রকে সাহায্য করিতে অন্য ধনীকে দরিদ্র করিতেছি! তাহাকে সাহায্য কে করিবে! মানুষ যে নিজ কর্ম্মদোষে দরিদ্র হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর স্বকর্ম্মবলে যে ধনী হয়, তাহাকে তাহার পুণ্যের ফল হইতে বঞ্চিত করিতে আমাদের কি অধিকার?"

এদিকে কমলেশ্বর রামচন্দ্র ও শ্যামচন্দ্রের ভোজনের জন্য, "অভ্যাগত অতিথি সাক্ষাৎ নারায়ণ" জ্ঞান করিয়া, সম্ভাষণ করিতে আসিলেন। কমলেশ্বরের সৌজন্য ও শিষ্টাচার দর্শনে রামচন্দ্র ও শ্যামচন্দ্র লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন। তখন ভ্রাতৃদ্বয় অবধূতকুলতিলক জীবানন্দের চরণতলে পতিত হইয়া, আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত-বিধি জিজ্ঞাসা করিলেন। জীবানন্দ উভয়কে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। এবং কুমার নদের তীরে কয়ড়ার মহাশ্মশানে সাধনাসন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। রামা-শ্যামা অবধূতরাজ জীবানন্দের উপদেশে কয়ড়ার আসনে তপস্যা করিতে বসিলেন।

জনপ্রবাদ এইরূপ, সদাশিব ব্রহ্মচারী কয়ড়ার প্রতিমা আপন হাতে গঠন করিয়াছিলেন। প্রতিমা এতই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যোড়শি মূর্ত্তি হইয়াছিল, যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া যখন ব্রহ্মচারী প্রতিমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন বিবসনা যুবতী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, তিনি লজ্জায় অধোমুখ হইলেন। তারপরে দিক্-বসনা জগজ্জননীকে তিনি বসন পরিধান করাইয়াছিলেন। সেই প্রথা আজ পর্য্যন্ত রহিয়াছে; কয়ড়ার করুণাময়ী সবসনা।

প্রতিমার সম্মুখে যে বেদী আছে তাহার মধ্যে একখণ্ড প্রস্তর আছে। খাঁকীবাবা বলিয়াছিলেন, তাহা কামরূপ হইতে জীবানন্দ আনাইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, কামাদেব কামাখ্যা হইতে এই প্রস্তরখণ্ড আনাইয়া বেদী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সদাশিব ব্রহ্মচারীর প্রতিষ্ঠিত হইলেও লোকে প্রায় "রামা-শ্যামার কালীবাড়ী"ই বলিয়া থাকে। রামা-শ্যামার পরে কামদেব যাদবানন্দ; তাঁহাদের পরে বিভূতিময় মহাপুরুষ রামদাস সাধু, এই কয়ড়ায় সাধনা করেন। দেবানন্দ নামে সাইতরনিবাসী একজন গৃহস্থ অবধূত সর্ব্বশেষে এইস্থানের সেবাধিকার লাভ করেন। প্রতিমার কলেবর মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তিত হয়।

যাহা হউক সুরথ সমাধির মত, মৃন্ময়ী প্রতিমা সম্মুখে করিয়া, রামচন্দ্র ও শ্যামচন্দ্র সাধনাসনে উপবেশন করিলেন। যাঁহাদের ভয়ে অঞ্চল কম্পিত হইত, যাঁহাদের নাম শ্রবণে ধনশালীর অধরোষ্ঠ ত্রাসে বিশুষ্ক হইত, পরস্বলুণ্ঠন যাঁহাদের ব্রত ছিল, তাঁহারা নির্ব্বিষয়ী নিষ্কাম হইয়া পরলোকের ধ্যানে আসীন হইলেন। তাঁহাদের বৈরাগ্য, তাঁহাদের তপস্যার কঠোরতা, তাঁহাদের ত্যাগস্বীকার দর্শন করিয়া সমস্ত দেশ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল। দস্যু বলিয়া যাঁহাদের দুর্নামে দেশ এক সময়ে ঝঙ্কারিত হইয়াছিল, কিছুদিন পরে সাধককুলতিলক নির্ব্বৈর প্রেমিক বলিয়া তাঁহাদের প্রশংসায় দেশ মুখরিত হইয়া উঠিল। তাঁহাদিগকে

দর্শন করিতে গঙ্গাস্নানের যাত্রীর মত অগণ্য লোক কয়ড়ার কালীবাড়ী আসিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে যাঁহারা রামা-শ্যামা দস্যুদ্বয়কে নররাক্ষস জ্ঞানে ঘৃণা করিতেন, বর্ত্তমানে তাঁহারা তাঁহাদিগকে পরমভাগবত জ্ঞানে, পরমভক্তির সহিত শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র ও শ্যামচন্দ্রের এই সৌভাগ্যোদয়ের একমাত্র কারণ শক্তিমান সাধক জীবানন্দের সঙ্গ।

সাধুসঙ্গের এমনই মহিমা! সাধুতার এমনই প্রভাব! ধর্ম্মাচরণের এমনি শক্তি! এবং জগদ্ধাত্রী জগজ্জননীর ভক্ত হইলে, এমনই প্রতিভা লাভ করিতে পারা যায়। সদাচারে আসীন হইলে দানবও দেবতা বলিয়া সম্পূজিত হয়।

দেবানন্দ কিছুকাল পরে কাশীধামে মুক্তিনাথের শ্রীচরণকমলে স্থান লাভ করিতে গমন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র ও শ্যামচন্দ্র কয়ড়ায় সাধনা করিতে লাগিলেন। সাত বৎসর তপস্যা করিয়া শ্যামচন্দ্রের হৃদয়ে ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মভাব জাগ্রত হয়। তিনি তখন কয়ড়ার কালীবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া পরমহংস পরিব্রাজকের মত তীর্থপর্য্যটনে সঙ্কল্প করিলেন, এবং স্নেহের আধার অগ্রজের নিকটে মনের সঙ্কল্প নিবেদন করিলেন।

জ্ঞানবিচারে ব্রহ্মবুদ্ধির উদয় হইলেও, রামচন্দ্রের মত পরম ভাগবত অগ্রজের সঙ্গ পরিত্যাগের সময়, একেবারে নিঃসম্পর্ক উদাসীনের মত গমন করিতে পারিলেন না। তিনি জীবনের শেষ বিদায়ের সময় স্বাভাবিক বিনয়বচনে বলিলেন, "দাদা, মানুষের প্রাক্তন ছায়ার মত অনুগমন করে। সেই সর্ব্বেশ্বরের বিধানে যত দিন একত্র থাকিবার কথা ছিল, একত্র ছিলাম; এখন পৃথক হইবার সময় আসিয়াছে। মন তাই জীবন্মুক্ত পুরুষের মত জীবনের অবশিষ্টাংশ যদৃচ্ছা ভ্রমণে সঙ্কল্প করিতেছে। আমার প্রার্থনা, আমাকে মুক্ত পুরুষের মত বিচরণ করিতে আদেশ প্রদান কর।"

অনুজের বিদায় প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া প্রেমের সমুদ্র তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল; কিন্তু প্রবীণ সাধক কৌশলে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—পিতা, মাতা বা সহোদর সহোদরার সঙ্গহারা হইলে, বিষয়বিতৃষ্ণ সাধকগণ সন্তপ্ত হন না, কিন্তু গুণবান বা সাধুসজ্জনের সঙ্গহারা হইলে, দুঃখিত বা বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। আবার সংসার-বিচারে যাঁহারা সহোদর সহোদরা, বা আত্মীয় কুটুম্ব, তাঁহারা যদি ভজন-সাধনের অনুকূল সঙ্গী হন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিরহ বিশেষরূপে কষ্টপ্রদ হয়। সর্ব্বনিয়ন্তা কাল; এবং কালেরও নিয়ন্ত্রী কালী। অতএব কোনও কর্ম্মে ক্ষুদ্র জীবের স্বাধীনতা নাই। তথাপিও

চিত্তে সজ্জনসঙ্গের বাসনা হয়। আমার মায়াবিমূঢ় মন উচ্চস্থানে আসীন হইয়া, উচ্চতম সামগ্রী জগজ্জননীর শ্রীচরণকমল লক্ষ্য করিতে পারে না। মা করুণাময়ী কালী কৃপা করিয়া, তোমার ন্যায় সর্ব্বগুণাকের সহোদর মিলাইয়াছিলেন, তাই সুখে দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, এতকাল তোমার আনুকূল্য লাভ করিয়া পরম সুখে অতিবাহিত করিয়াছি। এখন সেই বিশ্ববিধাত্রীর বাসনা হইলে তোমার সঙ্গহারা হইতে বাধ্য হইব। তবে মায়াবিমূঢ় মন প্রবোধ মানিতে চায় না।”

শ্যামচন্দ্র অগ্রজের অকপট অনুরাগমিশ্রিত, অথচ বৈরাগ্যপূর্ণ, বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন; হৃদয় বিগলিত হইল; নয়নকোনবাহিত অশ্রুবিন্দু বসনাগ্রে অপসারিত করিয়া ধীরভাবে আবার বলিতে লাগিলেন, "দাদা, তোমার ন্যায় বীরাগ্রগণ্য বীরের হৃদয়ে দুর্ব্বলতার অবস্থিতি শোভা পায় না। বিশ্বজননী মহামায়ার সন্তান কখনও মায়ার অধীন হন না। দাদা, আমি জন্মাবধি তোমারই আছি, তোমারই থাকিব। তোমার আদেশ আমার সর্ব্বপ্রধান বেদবাক্য। তুমি আদেশ করিয়াছ, তাই ধনীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া দরিদ্রকে বিতরণ করিয়াছি, তাই দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, জ্ঞানময় পুরুষ গুরুদেবের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, মা ব্রহ্মময়ীর কৃপা লাভ করিতে শ্মশান সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছি। এখন তুমি আদেশ করিলে ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অভিনয় দর্শন করিতে বাহির হইতে পারি, এবং জীবন্মুক্ত পুরুষের মত যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিয়া শেষ জীবনের অবসান করিতে পারি।

আমার মনে হয়, আমার ব্রহ্মময়ীর সাধনাসন সর্ব্বত্র; আমার ব্রহ্মময়ী মায়ের প্রতিমা আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সমানভাবে দৃশ্যমান। পর্ব্বতে, প্রান্তরে, অন্তরীক্ষে, সমুদ্রে, যে দিকে আমি দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই সেই ব্রহ্মময়ীর জীবন্ত প্রতিমা দর্শন করি। ঐ বৃক্ষ লতায় মায়ের মূর্ত্তি; ঐ চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র মধ্যে মায়ের মূর্ত্তি; ঐ মনুষ্য, পশু, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী মধ্যে মায়ের মূর্ত্তি; নিত্য আমি দর্শন করি। সুতরাং এই কয়ড়ার নির্দ্দিষ্ট সাধনাসনে আর আমার থাকিতে ইচ্ছা হয় না। তারপরে আমার জীবনের শেষদিন নিকটে আসিয়াছে, তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি। আমার বড় সাধ, এই পাপীষ্ঠের কলেবর মুক্তিক্ষেত্র কাশীধামে পতিত হয়। আমার অন্তিমের দেহ আপনি দর্শন করিলে অত্যন্ত ব্যথিত হইবেন; তাই আমার প্রার্থনা আমার এই দেহ আপনার অদৃশ্যস্থানে পঞ্চভূতে যেন মিশ্রিত হয়।”

রামচন্দ্র—তুমি ব্রহ্মময়ীর কৃপায় ব্রহ্মভাবে ভেদ বুদ্ধির নাশ করিয়াছ; ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম জ্ঞানখড়্গে বলিদান করিয়া মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রের মত শোভমান হইয়াছে। তোমার মানাপমান, শত্রুমিত্র নাই; লাভালাভ, জয়পরাজয়ে মনে উদ্বেগ নাই; তুমি এখন সমুদ্রতীরস্থ পর্ব্বতে বসিয়া ভবসমুদ্রের হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখের তরঙ্গাভিনয় দর্শন করিতেছ। তোমার সর্ব্বপ্রকার অনর্থের নিবৃত্তি ঘটিয়াছে; বাসনার শেষ হইয়াছে। সুতরাং মমতার বন্ধনে কে তোমাকে বদ্ধ করিতে পারিবে? ব্রহ্মময়ী মা তোমার মনোবাসনা অবশ্য পূর্ণ করিবেন। ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করা তাঁহার নিত্য কর্ম্ম।"

শ্যামচন্দ্র—করুণাময়ীর মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। সাধক-কুলতিলক রামচন্দ্রের চরণরেণু ভক্তিভরে মস্তকে পরিধান করিলেন। শেষে "জয় মা ব্রহ্মময়ীর জয়" বলিয়া কয়ড়ার সাধনাসন পরিত্যাগ করিয়া, নিরুদ্দেশ হইলেন।

রামচন্দ্র সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ মহাপুরুষগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।—

"শ্যামচন্দ্র নিরুদ্দেশ হইলে তিনি ভ্রাতৃবিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। করুণাময়ী কালীর প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অভিমান হয়। তিনি জগজ্জননীর দর্শন জন্য ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর কঠোর তপস্যা করেন। প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া কখনও কাতরস্বরে করুণা প্রার্থনা করিতেন, কখনও হতাশ হইয়া আত্মহত্যার উপক্রম করিতেন। কিছুতেই যখন জগজ্জননীর দর্শন লাভ করিতে পারিলেন না, তখন একদিন ক্রোধান্ধ হইয়া এক মুদ্গর ধরিয়া প্রতিমা চূর্ণ করিয়া কুমার নদের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে, স্নেহের হস্ত বিস্তার করিয়া জগজ্জননী তাঁহাকে দর্শন প্রদান করিয়াছিলেন।"

রামচন্দ্র মাঘীয় পূর্ণিমায় যোগবলে মধ্যরাত্রে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিত্যক্ত কলেবর স্থানীয় গ্রামবাসিগণ বহু সমারোহ করিয়া মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে হুতাশনদেবকে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র ও শ্যামচন্দ্রের সাধকাবস্থার নাম "রামানন্দ" ও "শ্যামানন্দ"।

কামদেব ও যাদবেন্দ্র।

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনীর শ্রীচরণকমলে অর্পিতমনবুদ্ধি অনন্যভক্তিযোগী শ্রীশ্রীকামদেব তার্কিক ও শ্রীশ্রীযাদবানন্দ অবধূত দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে ভূষণার রণরঙ্গিণীর মন্দিরে আসিয়া উপবেশন করিয়াছিলেন। ভূষণার শ্রীশ্রীগোপীনাথের মন্দিরের মোহান্ত বৈষ্ণবলোকগৌরব শ্রীশ্রীগোরাচান্দ গোস্বামী যাদবানন্দ ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোরাচান্দের বিরচিত শ্রীশ্রীসঙ্কীর্ত্তন-বন্দনা নামক প্রাচীন গ্রন্থে কামদেব ও যাদবানন্দ সম্বন্ধে অনেক ঘটনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই গ্রন্থ ভিন্ন লোকমুখে যাদবানন্দ-রচিত দুই চারিটী সঙ্গীতও প্রাপ্ত হওয়া যায়। খাঁকীবাবা, হরানন্দ সরস্বতী, রামানন্দ অবধূত এবং গজেন্দ্র গোঁসাই প্রভৃতি তান্ত্রিক সাধকগণের মুখেও এই দুই মহাপুরুষের অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি।

সমগ্র ভারতবর্ষে শাক্ত সম্প্রদায় মধ্যে যাঁহার "তন্ত্রতত্ত্ব" সর্ব্বোচ্চ সম্মানে পঠিত হয়, যাঁহার "তন্ত্রতত্ত্ব" অধ্যয়ন করিয়া, হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি উড্রফ্ সাহেব অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়া, সেই অপূর্ব্ব গ্রন্থ ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, যাঁহার প্রাণস্পর্শী মাতৃভাবপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সহস্র সহস্র নরনারী ভক্তির উচ্ছ্বাসে নয়নধারায় ভাসমান হইত, সেই পণ্ডিতাগ্রগণ্য ভাগবতোত্তম স্বর্গীয় শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়, এই কামদেব তার্কিকের বংশধর। আর ঘোষপুরের প্রসিদ্ধ ঘোষবংশ অবধূতলোকগৌরব যাদবানন্দ ঠাকুরের সন্তান। এই উভয় বংশ আজ পর্য্যন্ত গুরু শিষ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ।

গোঁসাই গোরাচান্দের শ্রীশ্রীসঙ্কীর্ত্তন বন্দনায় এই দুই মহাপুরুষের আগমন-সংবাদ এইরূপে বর্ণিত আছে :—

"কামদেব যাদবেন্দ্র দুই মহাজন।
শুভক্ষণে ভূষণায় হৈল আগমন।
শ্রীরণরঙ্গিণী মাই মন্দিরে বসিল।
একসঙ্গে চন্দ্র সূর্য্য উদিত হইল॥"

জনপ্রবাদে আগমন-সংবাদ আরও কিছু অধিকরূপে বর্ণিত হয়। "তাঁহারা বীরভূমের অন্তর্গত দ্বারকানদের তীরস্থ তারাপীঠে সাধনা করিতে আসন করিয়াছিলেন। উভয়ে উভয়ের উত্তর সাধক ছিলেন। সেস্থান হইতে

জগজ্জননীর আদেশানুসারে কুমার নদের তীরে কয়ড়ার কালীবাড়ীতে আসন গ্রহণ করেন এবং চাঁপাদহের তীরে সাতটী শ্মশানাসনে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। গোঁসাই গোরাচান্দের গ্রন্থে তাঁহাদের সাধনাসন সম্বন্ধে এইরূপে লিখিত আছে :—

"পশ্চিম হইতে আইল দুই জন চম্পকদহের তীরে।
হ্রদের উপরে বিলের আকার, গভীর শীতল নীরে।
রামাশ্যামা সিদ্ধি প্রাপ্ত যেইখানে তাহা হইতে সপ্তাসনে।
সপ্তাহ করিয়া সাধনা কৈল সপ্তগ্রাম লোকে জানে॥"

তাহা হইলে কয়ড়ার কালীবাড়ীতেও তাঁহারা সাধনার একটী আসন করিয়াছিলেন, অন্য ছয়টী আসন চাঁপাদহ বিলের তীর বাহিয়া মহাশ্মশান সমুহে পাতিয়াছিলেন। বিল তখন হ্রদের মত বৃহৎ ছিল। এবং তাঁহারা পশ্চিমদেশ হইতে আসিয়াছিলেন।

ভূষণার রণরঙ্গিণীর মন্দিরে প্রথম আসিয়া তাঁহারা উপবেশন করিয়াছিলেন। তখন রাজা সীতারাম মুসলমান সৈন্য পরাজিত করিয়া রাজা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভূষণায় তাঁহার কেল্লাবাড়ী ছিল। ভূষণা সর্ব্বপ্রধান বন্দর ছিল; তখন ভূষণায় কাগজ প্রস্তুত হইত (আমরাও বিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ভূষণার কাগজে লেখাপড়া করিয়াছি।) তামা পিতল কাঁসার কারবার ছিল; উত্তম কাপড় প্রস্তুত হইত; স্বর্ণ রৌপ্যের কারুকার্য্য হইত; গালা মোম প্রস্তুত হইত; চিনি প্রস্তুত হইত; এবং ভূষণায় বিচারালয় ছিল। ভূষণা পাঁচ ছয় মাইল দীর্ঘ নগর ছিল। এবং লক্ষাধিক লোক তাহাতে বাস করিত।

গোরাচান্দ গোস্বামী রণরঙ্গিণীর মন্দিরে তাঁহাদিগকে দর্শন করেন। যাদবানন্দ অবধূতের বৈষ্ণবীয় আচরণ ও তত্ত্বদর্শিতা দর্শন করিয়া তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার গুরুবন্দনায় যাদবানন্দের গুণকীর্ত্তন এইভাবে করিয়াছেন :—

"গুরু যাদবানন্দ আমার অবধূত মণি।
ভগবতী মাতা ভগবতীর মধ্যে গণি।
শিবদুর্গা যে দিখিবি আয় ত্বরা করি।
উজ্জল করি বসিয়াছেন বিশ্বাসের পুরী।
রাজা সীতারাম যানে দেখি হৈল মুগ্ধ।
মাসে মাসে যোগান যান চাল কলা দুগ্ধ।

হরিনাম বলিতে যান নয়নে বহে নীর,
গৌরাঙ্গ নাম শুনিতে হয় কম্পিত শরীর।
কৃষ্ণভক্ত যান প্রাণ তুল্য অনুক্ষণ।
যান মুখে সদাকাল কৃষ্ণ-আলাপন।
কিবা তত্ত্বজ্ঞান শাক্ত, বৈষ্ণব, যবন।
যে যায় সম্মুখে সেই গায় কৃষ্ণগুণ।
যবন ফকীর আইল সেহ বলে হরি,
দেবা কি মানবা ঠাকুর বুঝিতে না পারি।"
শাক্ত কি বৈষ্ণব তাহা কে পারে বলিতে।
গৃহস্থ কি সন্ন্যাসী তা কে পারে বুঝিতে।
সংসারী হইল কিন্তু সংসার না করে।
বৈষ্ণবের প্রাণ শাক্তের পরিচ্ছদ পরে।
কালী মন্দিরে করে বাস গায় কৃষ্ণনাম।
ভূষণার অঞ্চল হইল মহাতীর্থ ধাম।"

সঙ্কীর্ত্তন-বন্দনার এই অংশ অধ্যয়নে জানিতে পারা যায়, রাজা সীতারাম যাদবানন্দকে মাসে মাসে আহার্য্য প্রেরণ করিতেন। যাদবানন্দ পরম বৈষ্ণব ভাগবত ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া, তাঁহার তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিয়া কোন মুসলমান ফকিরও হরেকৃষ্ণনাম গ্রহণপূর্ব্বক বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাসের কন্যা ভগবতীকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেও নির্লিপ্ত গৃহস্থ ছিলেন, এবং ধর্ম্মবিশ্বাসে ভেদজ্ঞানশূন্য ছিলেন।

যাদবানন্দও কামদেবের সংসার পরিগ্রহ সম্বন্ধে সঙ্কীর্ত্তন-বন্দনায় এইরূপে লিখিত আছে—

"তখন তত্ত্বদর্শী যোগী সন্ন্যাসীর আগমন হইলে দেশের লোক তাঁহার সংবাদ লইত এবং তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিত। তখন চাঁপাদহের তীরস্থ ফুলগাছা নামক গ্রামে মাধববিশ্বাস নামে একটী ক্ষুদ্র জমীদার বাস করিতেন। ধনে মানে তিনি এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। দুইজন জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ চাঁপাদহের শ্মশানসমূহে নিশীথ রাত্রিতে সাধনা করিয়া থাকেন এবং মা আনন্দময়ীর মন্দিরে তাঁহারা অবস্থান করেন এ সংবাদ সপ্তগ্রামের লোকে অবগত হইয়াছিল। মাধব বিশ্বাস মহাশয়ও তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। একদিন তিনি যাদবানন্দকে সসম্মানে আপনার

গৃহে আনয়ন করিয়া শ্রীশ্রীদুর্গামণ্ডপে উত্তমাসনে উপবেশন করাইলেন। গ্রামের আবালবৃদ্ধ নরনারী মহাপুরুষ দর্শন করিতে বিশ্বাস মহাশয়ের প্রাঙ্গণে উপনীত হইল। ক্রমে তাঁহার কুমারী কন্যা ভগবতী দাসীর সহিত মহাপুরুষের সম্মুখে আসিলেন, এবং যাদবানন্দকে দর্শন করিয়াই অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিলেন। শ্রীশ্রীসঙ্কীর্ত্তন-বন্দনায় এইরূপে বর্ণিত আছে—

"যাদবানন্দকে যতন করিয়া বিশ্বাসভবনে লৈলা।
অতি সমাদরে শ্রীদুর্গামন্দিরে আসন পাতিয়া দিলা।
মহাভাগবত অবধূতকুল-গৌরব যাদবানন্দ।
তান দরশনে ধাইয়া আইল পাড়ার রমণীবৃন্দ।
নরদেব হেরি উলুধ্বনি করে নতিকরে ভক্তিমতি।
এমন সময় দাসীর সহিত আসিলেন ভগবতী।
দরশন করি দেব যাদবেন্দ্রে মাথায় ঘোমটা দিল।
কুমারীর কার্য্য নিহারি সকলে অতি চমৎকার হৈল।
পুছিল তাহানে কহ কি ঘটনা কহিলেন তেঁহ হাসি।
সাত জনমের পতি হন যেঁার এই অবধূত ন্যাসী।
মাধব কহে ইহা যদি হয় কন্যা বিভা দিব আমি।
তাহা না গণিব ব্রাহ্মণ চণ্ডাল যে হও সে হও তুমি॥"

মাধব বিশ্বাস মহাশয় এইরূপ অস্বাভাবিক কথা কুমারী কন্যার মুখে শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র চমৎকৃত হইলেন এবং যাদবানন্দকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যাদবানন্দ বলিলেন, "পূর্ব্বজন্মের কথা আমার স্মরণ হয় না। তবে এই বালিকাকে আমি আরও পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছি বলিয়া ধারণা হয়।"

যাদবানন্দ অবধূত সন্ন্যাসী। তিনি মাধব বিশ্বাসের কন্যা ভগবতীকে বিবাহ করিলেন। কামদেব তার্কিক মাধব বিশ্বাসের গুরু কালীশরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা রঙ্গিণী দেবীকে বিবাহ করিলেন। শ্রীশ্রীসঙ্কীর্ত্তন-বন্দনায় লিখিত আছে—

"বিশ্বাসের গুরু কালীশরণের তনয়া রঙ্গিণী দেবী।
কামদেবে তাহা প্রদান করিল মাধব করিয়া দাবী।"

বিবাহের পরে যাদবানন্দ অবধূতের পরিচয় অবগত হওয়া গেল। তাঁহার নাম যাদবেন্দ্র ঘোষ, কায়স্থবংশীয় কুলীন। বালি তাঁহার জন্মস্থান। মাধব বিশ্বাসের কন্যা বিবাহ করিয়া তাঁহার কুলভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি স্ববংশের কুলমর্য্যাদা রক্ষার জন্য আর স্বদেশে গমন করেন নাই।

"অবধূতে তবে পরিচয় হৈল নাম যাদবেন্দ্র ঘোষ।
কায়স্থ কুলীন কুলভঙ্গ হৈল নিজদেশে হৈল দোষ॥" সঃ বঃ

ভূষণার শ্রীশ্রীগোপীনাথ মন্দিরে গোরাচান্দ পরে মোহান্ত মহারাজ হইয়াছিলেন। তিনি দ্বাদশটী বৈষ্ণব সঙ্গে করিয়া, শ্রীশ্রীব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের সাধনক্ষেত্র বেনাপোল হইয়া স্বর্ণনদীর তীরবর্ত্তী কলাগাছি গ্রাম পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থানে তাঁহার পিতার শ্রীবিগ্র নন্দকিশোরকে দর্শন করিয়াছিলেন। গোরাচান্দের রচিত বহু সঙ্গীত এখন ভিখারী বৈষ্ণবগণ মধ্যে শ্রবণ করা যায়। তিনি পাঁচালীমঙ্গল গান করিতেন। শ্রীশ্রীসঙ্কীর্ত্তন-বন্দনা তিনি রচনা করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের কতকাংশ এখন দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকটে সংরক্ষিত আছে।

গোরাচান্দ বৈষ্ণবগ্রন্থে অধীয়ান শাস্ত্রদর্শী রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্মশানদাস বাবাজী তাঁহাকে ঘোপঘাটনিবাসী অদ্বৈতবংশীয় বলিতেন। ভূষণার স্বর্গীয় যজ্ঞেশ্বর মজুমদার মহাশয় বলিয়াছিলেন, "গোরাচান্দ গোস্বামী মোহান্ত সময়ের নাম। তিনি অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ছিলেন। নিজে প্রত্যহ একটী ভজন রচনা করিয়া গোপীনাথের সম্মুখে কীর্ত্তন করিতেন।"

যাদবানন্দ ভেদবুদ্ধিশূন্য ব্রহ্মবাদী অথচ অকপট ভক্তিমার্গের সাধক ছিলেন। জীবে দয়া তাঁহার সাধনার প্রধান সূত্র বলিয়া অনুমিত হয়। নিম্নে তাঁহার লোকপ্রচলিত দুইটী সঙ্গীত প্রদান করিতেছি—

"মনরে সাধনা কর যাঁর, শুন বলি তাঁর সমাচার,—
জগত জননী তিনি জগত সন্তান তাঁর॥
জননী তুষিতে যদি বাসনা,
তবে, জননীসন্তানে কেন কোলে করি বস না ?
সন্তানের গুণগানে রসনা, রাখ নিযুক্ত অনিবার॥
জগতের এই রীতি, জননীর হয় প্রীতি,
যতন করিলে তাঁর তনয়ের প্রতি,—
হীনপ্রাণীবধে রে যাদবানন্দ, কর মতি পরিহার॥"

"মা কর করালভয়বারিণি!
শিব আজ্ঞা তাই বাধ্য হইয়া মানি॥
আমার সঙ্কটে যদি তার মা, কেন ছাগের সঙ্কট ধার ধার না?
সে দুর্ব্বল তোমারই সন্তান তাকি হের না।
হর জীবত্রাস ত্রিজগততারিণি!
প্রচলিত প্রণালী করিতে নারি পরিহার,
নির্ব্বিশেষে জীবসেবা হল না মা আর আমার।
যাদবানন্দের দুঃখ শুনিও গো মা তুমি॥"

শুন হে সাধকবৃন্দ, সে যে আনন্দময়ী জননী।
জীবানন্দে শিবানন্দ আনন্দে শিবসঙ্গিনী॥
ছাগ মেষ মহিষবলি কি দিয়ে প্রশস্ত বলি
তবে, শিব আজ্ঞা বিরুদ্ধ বলিতে ভয় মানি।
যাদবার কপাল মন্দ, বলিদানে মনে সন্দ,
মার ঠাঁই সন্তান কাটি শান্তি না মানি॥

যাদবানন্দ ও কামদেব ভূষণা অঞ্চলে ২৪ বৎসর ছিলেন এবং সাধনবিভূতি-দ্বারা জনসাধারণের বহুরূপে বিস্ময় উৎপাদনপূর্ব্বক শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

"দোঁহার বিভূতি দরশন করি জগত বিমুগ্ধ হৈল।
চব্বিশ বরষ ভূষণা অঞ্চল বারাণসী হঞা রৈল॥" সঃ বঃ।

তাঁহাদের অবসান সম্বন্ধে এইরূপে লিখিত আছে। একদিন কামদেব প্রাতঃস্নান সময়ে "চরণ পিছলিয়া" পড়িয়া গিয়াছিলেন। তখন দেহের প্রতি অভিমান করিয়া দেহত্যাগে সঙ্কল্প করেন এবং প্রিয়তম সঙ্গী ঠাকুর যাদবানন্দকে ডাকিয়া মনের বাসনা প্রকাশ করেন—

"শুনরে যাদবানন্দ আমার এই সাধ এখন মনে।"

দেহত্যাগের সঙ্কল্প শ্রবণ করিয়া যাদবানন্দ তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করেন। ভাগোবতোত্তম তাঁহাদের প্রাণাধিক শিষ্য গোঁসাই গোরাচান্দের গ্রন্থে তাঁহাদের অবসান সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, ভক্তিমান পাঠকবর্গকে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া উপহার প্রদান করিতেছি।—

'প্রভাতে সিনান সময়ে ঠাকুর চরণ পিছলি পড়ে।
দেহের উপরে করি অভিমান দীরঘ নিশ্বাস ছাড়ে।

ডাকিয়া কহিল যাদবানন্দে, "যে লাগি আইনু মোরা।
ভাবিয়া দেখহ সেই প্রয়োজন হঞাছে এখন সারা।
আর কেন তবে রহিব এদেশে চল জননীর কোলে।"

* * * *

যাদবেন্দ্র কন "যে কহ উত্তম আমার কি আছে বাধা।
জয় কালী বলি চল দুইজন সাধিব মনের সাধা।"
কামদেব তবে কহেন "সকলে সাজাও আমার চিতা।
এলোক ছাড়িয়া সেলোকে যাইব যথায় জগতমাতা।"
গুরুর আদেশে সব শিষ্য মেলি চিতার আগুন জ্বালে।
পতঙ্গের মত ধাইয়া মানুষ আইল প্রভাতকালে।

* * * *

চিতা সজ্জীভূত দর্শন করিয়া জনমণ্ডলী অতিশয় সন্তপ্তচিত্তে শোকপ্রকাশ করিতে লাগিল। তখন কামদেব সকলকে সম্বোধন করিয়া আশ্বাসপ্রদান করিতে লাগিলেন।—

"দুই কুলে মোরা আবার আসিয়া জনমিব দুই জন।
সাধনার তত্ত্ব জাগ্রত করিব না হইও বিস্মরণ।
ধাউ ধাউ করি চিতার আগুন গগন পরশ করি।
জ্বলিয়া উঠিল দেব কামদেব জয়কালী নাম স্মরি।
পশিলেন সেই প্রলয় অনলে নির্ব্বাক হইল সবে।
সহস্র কণ্ঠেতে তুমুল ঘটিল হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রবে॥"

যেস্থানে কামদেব জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করেন, কুমারনদের তীরে তাহার ইষ্টকনির্ম্মিত বেদী বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। লোকে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। অল্পদিন পূর্ব্বে যাদবেন্দ্রের বংশধর স্বর্গীয় ষষ্ঠীচরণ ঘোষ সেইস্থানের জমীদার হইয়া সমস্ত শস্যক্ষেত্রে পরিণত করেন। কালের চক্রে সকলই সম্ভব হয়।

কামদেব ও যাদবেন্দ্রের দুই চারিটী গান ভিন্ন অন্য কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়না। কামদেব ও যাদবেন্দ্র উভয়ই ভক্তিমার্গের সাধক ছিলেন। কামদেবের চিতা প্রজ্জ্বলিত হইলে, যাদবেন্দ্র সেই বিপুল জনসঙ্ঘের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। গোঁসাই গোরাচান্দের সঙ্কীর্ত্তনবন্দনায় অভীষ্টদেব যাদবানন্দের জন্য বিলাপচ্ছলে এই পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে।

বিভূতিময় মহাপুরুষ।

রামদাস সাধু।

যাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহ, যাঁহারা আত্মসুখের মাথায় পদাঘাত করিয়া কেবল জীবসেবায় সর্ব্বস্বদানে সদানন্দ, যাঁহারা শ্রীভগবানের নাম-গুণানুবাদ-শ্রবণকীর্ত্তনের অবসর প্রাপ্ত হইলে, আহারনিদ্রা বিস্মৃত হইয়া যান, আর যাঁহারা "তৃণাদপি সুনীচ" হইয়া বিনয় ও ক্ষমার সাধনাকে যথার্থ গৌরবের কর্ম্ম মনে করেন, তাঁহারা বিভূতি প্রকাশের পক্ষপাতী না হইলেও, অনেক সময় তাঁহাদের কার্য্যকলাপে অত্যদ্ভুত বিভূতিসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত সাইতর পরগণার অধীন, রামনগর আখেড়ার প্রতিষ্ঠাতা রামদাস সাধু তাহার একজন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কয়ড়ার কালীবাড়ী হইতে ছয় মাইল পূর্ব্বদিকে সালুতাগ্রামে তিলিবংশে রামদাস সাধু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহস্থাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল "রামলাল কুণ্ডু"। বাল্যকাল হইতে তিনি তাঁহার গ্রামবাসিগণের সঙ্গে কয়ড়ার কালীবাড়ীতে যাতায়াত করিতেন এবং অভ্যাগত সাধু মহাপুরুষগণ দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেন, এবং সকলকে বলিয়া বেড়াইতেন, "আমি বড় হইলে সন্ন্যাসী হইব।"

এই সময় কৃষ্ণানন্দ অবধূত নামে একজন বৈষ্ণবাচারী মহাপুরুষ কয়ড়ার কালীবাড়ীতে অবস্থান করিতেন। সমাগত ভক্তমণ্ডলী তাঁহার নিকটে ভাগবত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া বিমুগ্ধ হইত ;—প্রত্যহ বৈকালে জগজ্জননীর মন্দিরের সম্মুখে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। লোকে তাঁহাকে "পণ্ডিত গোঁসাই" বলিত। তিনি যেমন শুদ্ধাচারী হরিভক্তিপরায়ণ ছিলেন, তেমনি যোগ-সিদ্ধ, পূর্ণ-জ্ঞানারূঢ়, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীও ছিলেন। তিনি বালক রামদাসের হৃদয়ে যে মহা প্রতিভার বহ্নি প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত ছিল, তাহা অনুভব করিয়া কৃপাপ্রকাশ-পূর্ব্বক তাহার বিদ্যাশিক্ষার ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন ; এবং বিদ্যাশিক্ষার ছলে তাহাকে মহাবিদ্যালাভের সন্ধান শিক্ষা দিয়াছিলেন। রামলালকে "রামদাস" নাম তিনি প্রদান করিয়াছিলেন। সুকৃতিবলে রামদাস বাল্যকালেই সদ্গুরু লাভ করিয়া একদিকে যেমন ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি যোগের কৌশলে অভ্যস্ত হইয়া যোগানন্দ অনুভবে কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

রামদাসের জননী ভগবানে স্থিরবিশ্বাসিনী ও ধর্ম্মাচরণপরায়ণা ছিলেন। সন্তানের ধর্ম্মপ্রাণতা দর্শন করিয়া তিনি আনন্দিতা হইতেন; এবং রামদাস যখন বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া সংসারী হইতে অস্বীকার করেন, তখন তিনি সাধারণী রমণীর মত তাঁহার সাধু-সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মানা না হইয়া বরং তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। পুণ্যশীলা জননী যখন দেহত্যাগ করেন, তখন রামদাস বিংশতি বৎসরের নবযুবক। তিনি পৈতৃক সম্পত্তির নিজাংশ সহোদরগণকে অর্পণ করিয়া উদাসীনের পরিচ্ছদ পরিধান করেন এবং গুরুদেবের সঙ্গে মিলিত হইয়া তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হন। চারি ধাম ও দ্বাদশ মহাতীর্থ তাঁহারা পর্য্যটন করেন; শেষে শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হন।

অবধূতরাজ কৃষ্ণানন্দের একজন বন্ধু জয়কৃষ্ণদাস বাবাজী এই সময়ে কাম্যবনে বাস করিতেন। তাঁহার সাধুতার প্রশংসা আজ পর্য্যন্ত বৃন্দারণ্য-বাসী বৈষ্ণবগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। মহৎসেবা না করিলে সাধকের চিত্ত ও চরিত্রের উন্নতি হয় না, অহঙ্কার নামক মহাসুরকে অন্তর হইতে বিতাড়িত করিতে পারা যায় না, তাই কৃষ্ণানন্দ রামদাসকে বৈষ্ণবলোকভূষণ জয়কৃষ্ণদাস বাবাজীর সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। রামদাস তাঁহার সেবায় সাত বৎসর অতিবাহিত করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন। শেষে গুরুগণের আদেশে শ্রীশ্রীমদনমোহন নামে এক শ্রীবিগ্রহ স্কন্ধে করিয়া পদব্রজে জন্মস্থানাভি-মুখে যাত্রা করেন এবং সুবিশুদ্ধ বৈষ্ণবাচার প্রচারপূর্ব্বক স্বদেশবাসীর চিত্তোন্নতিসাধনে যত্নবান হন।

বৃন্দাবন হইতে আসিবার সময়ই তাঁহার গুরুদেব বলিয়া দিয়াছিলেন "দেশে যাইয়া সর্ব্বাগ্রে তোমার মহাপুণ্যক্ষেত্র কয়ড়ায় গমন করিও এবং জগজ্জননীর মন্দির-দুয়ারে শিরলুণ্ঠন করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিও; কিন্তু কদাচ মায়ের মন্দিরের নিকটে আখড়া স্থাপন করিও না। মা যেমন সন্তানপালিনী, তেমনই সন্তানসংহারিণী। যাহারা সংহারিণী ভাবের উপাসক, তাহারা নির্দ্দয়রূপে সপ্তাহে সপ্তাহে নিরীহ ছাগাদি বলিদান করিবে, "জীবেদয়া" যাহার মূলমন্ত্র। তাহার তেমন স্থান অবস্থানযোগ্য নহে। হন্যমান পশুর আর্ত্তনাদে চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিবে; শেষে অনুরাগের হৃদয়ে বিরক্তির তরঙ্গ উত্থিত হইবে। তুমি রামনগরের খালকিনারে কুমার নদের তীরে আখড়া স্থাপন করিও।"

রামদাস গুরুদেবের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া কয়ড়ায় আসিলেন। জগ-জ্জননীর মন্দিরে প্রণাম করিয়া রামনগরের নিকটবর্ত্তী শিবপুরে এক ক্ষুদ্র কুটীর

নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীশ্রীমদনমোহনের সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার একখানি কন্থা ছিল; রাত্রে তাহার একপার্শ্বে শ্রীবিগ্রহকে শয়ন করাইয়া অন্যপার্শ্বে নিজে শয়ন করিতেন। ঠাকুরের সঙ্গে সারারাত্রি কথোপকথন করিতেন। প্রাতে মদনমোহন কি সেবা করিবেন, তাহা তিনি রাত্রে শুনিয়া রাখিতেন। সেবার সমস্ত কার্য্য নিজ হস্তে সম্পন্ন করিতেন। প্রত্যহ অতিথি অভ্যাগতের সেবা হইত। শ্রীশ্রীমদনমোহনকে দর্শন করিতে গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা মন্দিরের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইতে পারিত, কিন্তু কেহ কখনো আখেড়ার মধ্যে অবস্থান করিতে পারিত না।

যতদিন রামনগরের খাল কিনারে আখেড়া নির্ম্মাণের সুবিধা না হয়, তত্দিন তিনি শিবপুরেই বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যময়ী রাণীভবানী ও মহারাজা রামকৃষ্ণ এবং তারাসুন্দরী সকলেই রাজা সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুরে আসিয়াছিলেন। সাইতর পরগণা রাণীভবানী গ্রহণ করিয়া রাজা সীতারামের স্থাপিত শ্রীবিগ্রহ সমূহের সেবাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাণী-ভবানীর দয়াদাক্ষিণ্যের কীর্ত্তিকথায় তখন এই ভূষণা অঞ্চল মুখরিত হইয়াছিল। এই সুযোগপ্রাপ্ত হইয়া রামদাস সাধু রাণীভবানীর দুয়ারে প্রার্থীরূপে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং শ্রীশ্রীমদনমোহনের সেবা ও আশ্রম জন্য কিছু ভূমিভাগ প্রার্থনা করিলেন।

রাণী ভবানী রামদাস সাধুর পাণ্ডিত্য ও আত্মোন্নতির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে বহুমানে সম্বর্দ্ধনা করিলেন, এবং তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতে মহারাজা রামকৃষ্ণকে আদেশ করিলেন। রামদাস বলিলেন "আমার একখানি কন্থা আছে; আমি তাহার একপার্শ্বে শয়ন করি; আর মদনমোহনকে অন্যপার্শ্বে শয়ন করাইয়া রাখি। সেই কন্থাখানির পরিমিত একটু স্থান রামনগরের খাল কিনারে প্রাপ্ত হইলেই আমার যথেষ্ট হইবে।" প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া সকলেই মৃদু হাস্য করিলেন।

রাণী ভবানী সাইতর পরগণার নায়েবকে রামদাসের কন্থাপরিমিত ভূমিখণ্ড তাঁহার ইচ্ছানুরূপ স্থান হইতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। রামদাস পরগণার নায়েবকে সঙ্গে করিয়া রামনগরে আসিয়া বিলভোতন সম্মুখে করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কন্থা আনাইয়া তাহার চারি কোণ চারিজন বরকন্দাজের হস্তে দিয়া বিস্তৃত করিতে বলিলেন। তাহারা চারি কোণ ধরিয়া চারিদিকে চলিতে লাগিল; কন্থাও ক্রমবিস্তৃত হইয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে

চলিতে লাগিল। ক্রমে সাড়ে পাঁচ শত বিঘা জমী কন্থার মধ্যে পতিত হইল তবুও কন্থার বিস্তৃতির শেষ হইল না।

তখন সেই পরগণার নায়েব বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর, যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে সমগ্র সাইতর পরগণার উপর এই কন্থা পাতিলেও ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থের সমান হইবে না। বায়ান্ন লাখ তেপ্পান্ন হাজারের জমীদারী দান করিতে আমার অধিকার নাই; অথবা এই "বলীরাজার ত্রিপাদ ভূমি" দান করিতে—এক কাঁথা পাতিয়া সমগ্র বিলভোতন আপনাকে দেবোত্তর দিতে, আমার প্রতি আদেশ নাই। সুতরাং আমাদ্বারা আপনার জমী নির্দ্দেশ অসম্ভব।"

রাণী ভবানীর নিকটে সংবাদ প্রেরিত হইল। রামদাসের বিভূতি শ্রবণ করিয়া তিনি বিস্মিতা ও আনন্দিতা হইলেন; সাড়ে পাঁচশত বিঘা নিষ্কর দেবোত্তর রামদাসকে প্রদান করিলেন। আজ পর্য্যন্ত সেই রাণী ভবানীর প্রদত্ত সনদ রামনগরের আখেড়ায় বিদ্যমান আছে। কিন্তু আখেড়ার সম্পত্তির অধিকাংশই নানা লোকের হস্তগত।

যাহা হউক, মহাপুরুষের এই বিভূতি দর্শন করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিল। যে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিতে, যে নাম প্রেম প্রচার করিতে তিনি দেশে আসিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। দলে দলে গ্রামবাসিগণ "জয় হরে গৌরাঙ্গ" বলিয়া, হরি সঙ্কীর্ত্তনের নিশান উড়াইয়া, রামনগরে আসিতে আরম্ভ করিল। অল্পদিনের মধ্যে অগণ্যলোক হরিভক্ত হইল। হরিনামের ঝঙ্কারে সমস্ত দেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

রামনগরে সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে আশ্রম নির্ম্মিত হইল। ইষ্টক নির্ম্মিত মদন-মোহনের মন্দির উত্থিত হইল। নিত্য মহোৎসব নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। রামদাস শিবপুরের আখেড়া একেবারে পরিত্যাগ করিলেন না। শিবপুরে ও রামনগরে আপন হাতে তিনি নানারূপ ফলের বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। এই সকল বৃক্ষের মধ্যে আম, কাঁঠাল, নারিকেল বৃক্ষই অধিক। তাঁহার সময়ে আম, কাঁঠাল বারমাসই প্রাপ্ত হওয়া যাইত, এবং কেহ তাঁহাকে জানাইয়া, কেহ না জানাইয়া, কেহ দিনে, কেহ রাত্রে, স্বাধীনভাবে তাঁহার বাগান হইতে ফল পাড়িয়া লইয়া যাইত। তিনি সকলের ব্যবহারেই সমান সন্তুষ্ট থাকিতেন এবং সকলের প্রতিই সমান সমাদর, সমান স্নেহ প্রকাশ করিতেন। চোরে কাঁঠাল পাড়িয়া চুপি চুপি পলায়ন করিত, আর তিনি তাহাকে ডাকিয়া তামাকু

সেবন করাইয়া, তাহার পরিজনবর্গের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, সস্নেহে বিদায় করিতেন। শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন মধ্যস্থ দ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুম্বপিচ পাপিষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥"

এই ভগদ্বাক্যের সার্থকতা মহাপুরুষ রামদাসের নিকটে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ত্যাগের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত রামদাস, অনাসক্তির উত্তম আসন রামদাস, আর প্রেমের অত্যুজ্জ্বল সিংহাসন রামদাস !!

শিবপুরের আখেড়ায় এক অত্যদ্ভুত নারিকেল বৃক্ষ আছে, তাহাতে কেবল ছোবাময় নারিকেল ধরে। সে নারিকেলের মধ্যে শাঁস নাই খুলি নাই, জল নাই,—কেবল ছোবা,—একটা ছোবারই পিণ্ড! এই নারিকেল বৃক্ষের উৎপত্তির ইতিহাসও অতি চমৎকার। একবার একদল চোর নারিকেল পাড়িয়া বাগানের মধ্যে বসিয়াই ভোজন করিতেছিল। সহসা সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত রাত্রে বাগানে কে রে?"

চোরের দল—"আজ্ঞে আমরা; দুটো নারিকেল সেবা কর্‌ছি।"

রামদাস—"তা বেশ কর্‌ছিস্; তবে ওখানে জঙ্গলের মধ্যে কেন? এই পরিষ্কার স্থানে আয়।"

চোরের দল—"আজ্ঞে খাওয়া শেষ হয়েছে। এখন যেতে ইচ্ছা করি।"

রামদাস—"আচ্ছা এক কাজ কর্, ছোবাগুলি ঐস্থানে পুঁতে রেখে যা। গাছ হলে আবার এসে নারিকেল খেতে পার্‌বি।"

চোরের দল—"ছোবায় কি গাছ হয়?"

রামদাস—"মদনমোহনের ইচ্ছা হলে ছোবায় ও গাছ হয়।"

সাধুর আদেশানুসারে তাহারা ছোবাগুলি একত্র করিয়া একস্থানে পুতিয়া রাখিয়া গেল। সেই ছোবা হইতে কিছুদিন পরে এই তেজস্বী বৃক্ষের উৎপত্তি হইল। কালক্রমে বৃক্ষে নারিকেল ধরিল। গ্রাম্য লোকের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। বাগানে আবার চোর প্রবেশ করিল। উৎসাহে উল্লাসে নূতন গাছের নারিকেল পাড়িয়া ছুলিতে বসিল। কিন্তু নারিকেল ছুলিয়া তার মধ্যে শাঁস মিলিল না—কেবল ছোবা! ছোবারই একটা পিণ্ড! সকলে বিড়ম্বিত হইয়া ঠাকুরের নিকটে গমন করিল। ঠাকুর হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "পুতলি ছোবা, ছোবায় গাছ হ'ল; ছোবার গাছে কি নারিকেল ধরে? ধরিলেও

কেবল ছোবাই হয়। চোর জব্দ করার জন্য মদনমোহন ঐ গাছ করেছেন। তোরাও যেমন চোর, ঐ গাছও তেমন চোর!"

সমস্ত সম্প্রদায়েই বিভূতির সাধক দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সময় মুসলমান ফকীর সাগেরসা দেওয়ান এই দেশে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকাণ্ড এক বাঘের উপরে চড়িয়া বেড়াইতেন। আবদুল জব্বর নামে তাঁহার এক শিষ্য ছিলেন। তিনি ধনশালী ছিলেন এবং শিবপুরে তাঁহার গৃহে সাগেরসা দেওয়ান বৎসরে একবার আগমন করিতেন। সাগেরসা বাঘের উপরে আসিতেন, অগণ্য লোক তাঁহার সঙ্গে থাকিত। তিনি একবার জব্বরের বাড়ী উপস্থিত হইয়াই বলিলেন "জব্বরে, তুই শীঘ্র রামদাসকে ডেকে আন ত! বলিস আমার হুকুম!"

জব্বর আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া রামদাস সাধুর নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং যথারীতি অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "হুজুর, দেওয়ান সাহেব আসিয়াছেন। হুজুর ত জানেন, তিনি বাঘের পীঠে চড়িয়া বেড়ান; আসিয়াই হুকুম করিয়াছেন, রামদাসকে ডাক্। আমি দেওয়ান সাহেবের হুকুম জানাইতে আসিয়াছি।"

মহাপুরুষ রামদাস তখন প্রকাণ্ড এক খেজুর গাছের উপরে বসিয়াছিলেন। ঐ খেজুর গাছ ঝড়ে ভূমিসাৎ হইয়াছিল। তিনি দেওয়ান সাহেবের হুকুম শুনিয়া বলিলেন, "আহা আমার বহু ভাগ্য দেওয়ান সাহেব আসিয়াই আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার কৃপারই পরিচয়। আচ্ছা চল, আমি যাইতেছি।" জব্বরকে এই কথা বলিয়া পদতলস্থ খেজুর গাছকে বলিলেন, "বাবা তবে আর বিলম্ব করিও না। তিনি যখন বাঘের পিঠে আসিয়াছেন, তখন আমি তোমার পিঠে না যাইলে শোভা পাইবে না।"

খেজুর গাছ তখন সুবৃহৎ সর্পের মত ঝোড় জঙ্গল ভাঙ্গিয়া চলিতে লাগিল। আবদুল জব্বর তখন এই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইলেন, এবং সাগেরসাকে যাইয়া বলিলেন, "সাহেব, আপনি ত জীবিত বাঘের পীঠে আসিয়াছেন, তিনি জীবনহীন খেজুর গাছের উপরে আসিতেছেন। আপনার হুকুম জীবিত প্রাণী মান্য করে, তাঁহার হুকুম নির্জ্জীবেও মান্য করে। সেই খেজুর গাছ যদি লাঠি হয়, আপনার বাঘের মত হাজার বাঘশুদ্ধ আপনাকে এক নিমিষে বিনাশ করিয়া যাইবে।"

জব্বরের মুখে সংবাদ শুনিয়া সাগেরসা হাসিতে লাগিলেন, এবং রামদাসকে

অভ্যর্থনা করিবার জন্য পদব্রজে অগ্রবর্ত্তী হইলেন। রামদাসকে নমস্কার করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। রামসাদ দেওয়ান সাহেবকে আলিঙ্গন করিলেন। সাধকের সম্মান সাধকেই অবগত। শেষে সাগেরসা বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর, এই দেশে তোমার বিভূতি যত বিস্তৃত হইবে, দেশের লোক তত অধিক উপকৃত হইবে। আমি তোমার মহিমা প্রচার করিতে আজ তোমাকে ডাকিতে আসিয়াছি। যাহা হউক এখন হইতে তোমার আখেড়ায় প্রতি বৎসর রাসের সময় পাঁচটী তাল ও সওয়া সের কাশীর চিনি নজর স্বরূপে আমার আস্তানা হইতে প্রেরিত হইবে। যতদিন তোমার ও আমার শিষ্যবর্গ বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন এই বার্ষিক বন্ধ হইবে না।" বর্ত্তমান মহান্ত পরমানন্দ দাঁসের প্রথম সময় পর্য্যন্তও এই বার্ষিক বন্ধ হয় নাই। এখন সাগেরসা দেওয়ানের আস্তানায় কোন শিষ্য সেবক নাই। থাকিলেও রামদাস সাধুর পুণ্যক্ষেত্র রামনগর আখেড়ায় যে অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহাতে মহাপুরুষ দেওয়ান সাহেবের বার্ষিক বন্ধ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এখনও বিস্তৃত বাগান আছে, রামদাস ঠাকুরের হাতের ও দুএকটী বৃক্ষ আছে, কিন্তু আর বার মাস আম কাঁঠাল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে আশ্রমে স্ত্রীলোক বাসনপত্র মাজিবার জন্যও প্রবেশ করিতে পারিত না এখন সেই আশ্রমে জোড়ায় জোড়ায় সেবাদাসী লইয়া মোহান্তেরা দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শয়ন করেন। দেবতার গৃহে এখন ভূতের বাসা। হৈয়ঙ্গবীনের ভাণ্ডে এখন আদাড়ের ছাই! সমস্তই মানবের কর্ম্মফল এবং শ্রীশ্রীমদন মোহনের সুমঙ্গল বিধান।

যে সকল বিভূতি অবলম্বন করায় অন্যান্য দেশে সাধকগণ অবতার বলিয়া পরিপূজিত হন, পুণ্যভূমি আর্য্যঋষিকুলের সাধনক্ষেত্র, এই ভারতবর্ষে, সাধকের ঘরে ঘরে তাহার অগণ্য দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামদাস সাধুর বিভূতির বিষয় আমরা অতি অল্পই প্রকাশ করিলাম। মাত্র দেড়শত বৎসরের কথা; রামনগর অঞ্চলে আবাল বৃদ্ধের মুখে আজ পর্য্যন্ত ইতিহাসের নূতনত্ব অপগত হয় নাই। আমি রামদাস সাধুর সমাধি স্থান প্রদক্ষিণ করিয়া, শ্রীশ্রীমদন মোহনকে প্রণাম করিয়া, গ্রামসমূহের সমাগত ভক্তগণ-মুখে শ্রবণ করিয়া এই প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিলাম। পরমানন্দ মোহান্তের বয়ঃক্রম এখন পঞ্চাশীতি বৎসর।

রণবাড়ীর কৃষ্ণদাস বাবাজী।

শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ক্ষেত্রের অন্তর্গত বর্ষান হইতে তিন চারি ক্রোশের মধ্যে রণবাড়ী। এই স্থানে বৈষ্ণব জগতের শিরমুকুটমণি কৃষ্ণদাস বাবাজী সাধনা করিতেন। রণবাড়ীর অধিবাসিগণ তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে অর্চ্চনা করিতেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারিলে আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। এবং সুখদুঃখ সম্পদ বিপদের কথা তাঁহার নিকটে নিবেদন করিয়া পরম শান্তি লাভ করিতেন।

তিনি চারি ধাম পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, শেষে বৈষ্ণবের চরম-লক্ষ্যে কৃষ্ণ-সংকল্প হইয়া, জীবনের শেষ দিন ব্রজমণ্ডলে অতিক্রম করিতে, রণবাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। সাধনার ত্রিবিধ অবস্থা অতিক্রম করিয়া ভাবরাজ্যের রাজ-সিংহাসনে আসীন হইয়াছিলেন। আর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মাধুর্য্যরসে মজ্জমান হইয়া সংসারের কোলাহলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিলেন।

তিনি সংসারের ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম ও বিধি-নিষেধের গণ্ডীর বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। এই পৃথিবীপৃষ্ঠেই আনন্দধামের শান্তিসুখ আস্বাদনে তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন। এবং গ্রাম্যালাপ, গ্রাম্য কোলাহল হইতে বহুদূরে মনকে স্থাপন করিয়া তিনি অনপেক্ষ ভাগবতের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জগৎসমক্ষে স্থাপন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস বাবাজী দ্বারকাতীর্থে গমন করিয়া, সেই তীর্থের মঙ্গলময় চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। দ্বারকার চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। একবার একটী পোষাকী বাবাজী তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি কৃষ্ণদাসকে বলিয়াছিলেন, "বাবাজী মহারাজ, আপনার শ্রীঅঙ্গে দ্বারকাধামের পবিত্র চিহ্ন দর্শন করিতেছি। আপনার এই কলেবর দ্বারকার আকাশে অন্তর্হিত হইবে। ইহা শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলের রজলাভে কৃতার্থ হইবে বলিয়া বোধ হয় না।"

আগন্তুকের ভবিষ্যৎবাণী শ্রবণে বালকস্বভাব মহাপুরুষের অন্তরে ভাবনার আগুন প্রজ্জলিত হইল। তিনি আপন মনে শ্রীশ্রীবৃষভানু রাজকুমারীকে উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন :—"হে গোবিন্দ-প্রেমবিলাসিনি! হে সর্ব্বজীবানন্দ-দায়িনি! আমাকে নিরানন্দ করিও না। তোমার যে করুণায় এই ব্রজ-ভূমির পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ তরুলতা পর্য্যন্ত পরমানন্দ ভোগ করে, এবং অন্তকালে

এই পরমধামের পবিত্র রজে মিশ্রিত হইতে পারে, সে করুণায় দীনহীন আমাকে বঞ্চিত করিও না। হে ব্রজলোক-রক্ষয়িনি! আমি অপরাধী হইলেও তোমার শ্রীচরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, আমাকে পরিত্যাগ করিও না। আমি নিত্য অপরাধী, আর তুমি নিত্য ক্ষমাময়ী। তোমার শ্রীচরণলাঞ্ছিত, সাধক-লোকবাঞ্ছিত সুপবিত্র ব্রজলোকে আমাকে স্থান দান কর।” মর্ম্মবেদনায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, আর্ত্তস্বরে দিবারাত্রি এইরূপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এইভাবে ক্রমে চারিদিন অতীত হইল। এই চারিদিন দুর্ব্বিসহ মর্ম্মবেদনায় ও দুরন্ত চিন্তায় তাঁহার দেহে বার্দ্ধক্যের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইল। তাহার মস্তকের কেশ শুভ্র হইল এবং শরীরের চর্ম্ম শিথিল হইল। তাঁহার এই অসম্ভব ভাবান্তর দর্শনে তাঁহার আশ্রম অগণ্য লোকে লোকারণ্য হইল। রণবাড়ীর অধিবাসিগণ তাঁহাদের প্রাণ সর্ব্বস্ব আরাধ্য বাবাজীর জন্য ব্যাকুলান্তরে গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বাবাজীর আশ্রমে দিবারাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম দিনে প্রভাতকালে কৃষ্ণদাস বাবাজীর চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি হইতে সহসা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। মোমবাতির মত দেহ জ্বলিতে লাগিল। এই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিতে অগণ্য লোক পিপীলিকাশ্রেণীর মত রণবাড়ী উপস্থিত হইতে লাগিল। যখন দেহের নিম্নভাগ হুতাশন দেব গ্রহণ করিলেন, দেহগেহ পরিত্যাগ করিতে জীবন যখন প্রস্তুত হইল, চিরবাঞ্ছিত ব্রজের রজ লাভ করিবার সময় যখন নিকটে আসিল, তখন বাবাজীর নির্ব্বাক বদনে বাক্‌স্ফুর্ত্তি হইল, বিষন্নতার স্থান প্রফুল্লতা অধিকার করিল, এবং বিপুল জনসঙ্ঘকে বিমুগ্ধ করিয়া, বৈষ্ণবীয় নম্রতার গৌরব রক্ষা করিয়া, মৃদুমধুর হাসিভরা মুখে তিনি বলিতে লাগিলেন, “সেই বাবাজী মহারাজ ভুল বুঝিয়াছিলেন; তাই বলিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলের রজলাতে বঞ্চিত হইয়া আমার এ দেহ দ্বারকায় পতিত হইবে। কিন্তু এই ত আমার এ দেহ ব্রজের রজলাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। এই ত পরম করুণাময়ী রাধারাণী আমাকে তাঁহার ব্রজমণ্ডলে স্থানদান করিলেন। আহা! অপরাধী অযোগ্য হইয়াও যদি কেহ সেই ভক্তবৎসলা, দীনদয়াময়ী, আহ্লাদিনী ঠাকুরাণীর শরণ গ্রহণ করে, তাহাকেও তিনি তাহার বাঞ্ছিত বর প্রদান করিয়া থাকেন।

সাধকের শেষ কথা সমাগত লোকমণ্ডলি শ্রবণ করিয়া নিঃসন্দেহ হইলেন। রণবাড়ী রাধাগোবিন্দ নামের জয়োল্লাসে মুহুর্মুহু ঝঙ্কারিত হইতে লাগিল।

অধিবাসিগণ আর্ত্তনাদে আত্মহারা হইলেন। রণবাড়ীর নিত্যসুধাকর অন্তর্হিত হইলেন—শান্তির উৎস সহসা শুকাইয়া গেল, বৃন্দাবনযাত্রীর প্রাণ জুড়াইবার প্রত্যক্ষ দর্শন ফুরাইয়া গেল, এবং সমগ্র বৈষ্ণব জগতের মুকুটমণি খসিয়া পড়িল। কিন্তু বৈষ্ণবীয় সাধনার অদ্ভুত শক্তি ও বিভূতি চরাচরে প্রকাশিত হইল। ইহা মাত্র পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা।

ফুলেলা।

"ধূমা উড়ে, উড়ে ছাই,
তবে মেয়ের গুণ গাই।"

রঘুনন্দন পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশে হাম্নদী। রণচাপ এই নদীর তীরে অবস্থিত। আমি কুকীর অঞ্চল পর্য্যটন করিয়া এইস্থানে উপস্থিত হই এবং রাজচন্দ্র দাসের বাড়ী কিছুকাল অবস্থান করি। রণচাপ লংলা পরগণায়। এইস্থানের বর্ত্তমান জমীদার আলি আমজাদ সাহেব। তিনি আমাকে আপন ভবনে লইয়া যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিলেন।

আমি বৈকালে ও প্রাতঃকালে ভ্রমণ করি। নিকটেই চা বাগান, কখনো চাবাগানে যাই, কখনো হাম্ন পার হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের মধ্যে ভ্রমণ করি। কখনো জঙ্গলের ধারে একাকী বসিয়া নির্জ্জনতা অনুভব করি। এখন শীতকাল, এইস্থানে অত্যন্ত শীত।

একদিন প্রায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ছোট একটী পাহাড়ের নিম্নে বসিয়া আছি, এমন সময় একটী বৃদ্ধ বৈষ্ণব আমার নিকটে আসিলেন। আমার পরিচয় লইয়া, আমাকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া গেলেন। তাঁহার দুইটী সেবাদাসী আছে। একটী অতিবৃদ্ধা, অন্যটী প্রৌঢ়া। চরিত্রবিষয়ক আলোচনা আরম্ভ হইলে, সেই বৃদ্ধা বলিলেন, "বাবা চরিত্র উত্তম কথা বটে, কিন্তু এবার আর পারিলাম কৈ? বিশেষতঃ আমাদের স্ত্রীলোকের চরিত্র, যতদিন এ দেহ ভস্মীভূত না হয়, ততদিন আর এ দেহকে বিশ্বাস নাই। ফুলেলা তাহার সাক্ষী।

আমি ফুলেলার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতে লাগিলেন, "এই হাম্নর তীরে এক ধনশালী বণিক বাস করিত। সে মরণ সময়ে আপনার পত্নী ফুলেলাকে বলিয়াছিল "ফুলেলা, আজ আমার জীবনের শেষদিন; আমি ভাবিতাম, তোমার সঙ্গে কখনো পৃথক হইব না। কিন্তু দেখিতেছি, কালের কঠোর শাসনে

আজ তোমার সঙ্গে পৃথক হইয়া আমাকে একাকী যাইতে হইল।” বলিতে বলিতে বণিকের চক্ষে জলবিন্দু দেখা দিল।

ফুলেলা স্বামীর আসন্ন দশায় অতিমাত্র অবসন্না হইলেও অনেক পরিমাণে ধৈর্য্য ধরিয়া, তাহার সেবাশুশ্রূষা করিতেছিল। সে দেখিল, তাহার স্বামী তাহাকে যেন কিছু বলিতেছিল, কিন্তু শোকে রুদ্ধকণ্ঠ হওয়ায় বলিতে পারিল না। সে তখন প্রিয়তম স্বামীর মস্তক আপনার ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া অশ্রুসিক্তবদনে জিজ্ঞাসা করিল “আপনি কি বলিতেছিলেন?”

বণিক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিতে লাগিল, “আর বলিতেছিলাম !! ফুলেলা, আমি ত চলিলাম, তুমি রহিলে। মৃত্যুযাতনা অপেক্ষা তোমাকে ত্যাগ করিবার যাতনাই অধিকতর হইয়াছে। এতকাল তোমাকে সর্ব্বস্বজ্ঞানে কেবল তোমারই সেবা করিয়াছি। লোকে পরকালের জন্য পরমেশ্বরের আরাধনা করে, কিন্তু আমি তাহা ভুলিয়া কেবল তোমারই আরাধনা করিয়াছি! তোমার জন্য এই সম্পদরাশি সংগ্রহ করিয়াছি। আজ তোমাকে কোন অভাবে ফেলিয়া যাইতেছি না। তোমাকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পরের গলগ্রহ হইতে হইবে না। মহাযাত্রাকালে তোমার নিকটে আমার এই প্রার্থনা, তুমি বিশ্বাসিনী থাকিও। আপনার সতীধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিও না। আমার এই অন্তিমদিনের মর্ম্মকথা তুমি যদি রক্ষা কর, তাহা হইলে পরলোকে আমার শান্তি হইবে।” বলিতে বলিতে বণিক দীনভাবে ফুলেলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। তাহার প্রাণবায়ু অনন্ত আকাশে মিশিয়া গেল। ফুলেলা শোকে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিল। যখন প্রকৃতিস্থা হইল, তখন পতির আসন্নকালের উপদেশ মরণপণ করিয়া স্মরণ করিল, এবং তাহা প্রতিপালন করিতে বিধাতাকে সাক্ষী করিয়া শপথ করিল।

বণিকের তিনটী পুত্র ও দুইটী কন্যা ছিল। ফুলেলা এই সন্তানগুলিকে লইয়া এবং মৃতপতির অনুরাগ অন্তরে ধরিয়া, সাবধানে দিনযাপন করিতে লাগিল। সে উত্তম বসন পরিধান করিত না, উত্তম ভোজন করিত না, এবং কোন যুবকের সম্মুখে যাইত না। যেস্থানে উৎসব হইত, অথবা লোকযাত্রা হইত, সেমুখেও সে হাঁটিত না।

হামুনদীর কিছুদূর উপরেই কুকীজাতির বাসভূমি। ইহারা সময় সময় নীচে আসিয়া লোকালয়সকল লুণ্ঠন করিত, সাঙ্ঘাতিক খড়্গের আঘাতে অসংখ্য নরনারীর প্রাণবিনাশ করিত এবং স্ত্রীলোক দেখিলেই বলপূর্ব্বক ধরিয়া আপনাদের জঙ্গলে লইয়া যাইত। পার্ব্বত্য কুকীর প্রদত্ত আহার্য্য এই সকল

স্ত্রীলোক সহ্য করিতে পারিত না। কেহ বা অনাহারে মরিত, অবশিষ্ট কুকীর পাশবিক অত্যাচারে কঠোর যন্ত্রণায় প্রাণ হারাইত। মাত্র ত্রিশবৎসর পূর্ব্বেও দক্ষিণ শ্রীহট্টের অধিবাসিগণ কুকীর ভয়ে ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া অবস্থান করিয়াছে। ফুলেলার সময় যমের ভয় অপেক্ষা কুকীর ভয় অধিক ছিল।

ফুলেলার বয়স যখন বত্রিশ বৎসর, তখন একবার কুকী আসিয়া গ্রামসকল লুণ্ঠন করিতে লাগিল। কতশত স্ত্রীলোকের সতীত্ব তাহারা নষ্ট করিল; কত বালক, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, তাহাদের নির্দ্দয় ছোরার আঘাতে কালের কোলে শায়িত হইল। প্রাণরক্ষার জন্য বহুলোক বহুদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ফুলেলাও আপন সন্তানগুলিকে লইয়া এক জঙ্গলের মধ্যে পলাইয়া রহিল। অসভ্য কুকীর ভয়ঙ্কর অত্যাচার হইতে সেযাত্রা সে রক্ষা পাইল।

তারপর বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সৈন্যদল সেখানে প্রেরিত হইল। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অনেক সর্দ্দার বশ্যতা স্বীকার করিল, অবশিষ্টেরা দুর্গম জঙ্গলে নিরুদ্দেশ হইল। কুকীর ভয় বিদূরিত হইল।

কিছুদিন পরে একদিন বৈকালে ফুলেলা হান্নুনদীর তীরে যাইয়া উপবেশন করিল। নদীর উভয় তীরে উচ্চ উচ্চ পাহাড়। লোকের গতিবিধি একেবারেই নাই। নির্জ্জনতা ও নিস্তব্ধতা হান্নুর শরীরে যেন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য মাখাইয়া রাখিয়াছে। তখন সূর্য্যদেব পর্ব্বতের অন্তরালে পতিত হওয়ায় নদীবক্ষে ছায়া পড়িয়াছে। নদীর স্রোত যেন বিষণ্ণতা মাখিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছে। ফুলেলা এই সকল দেখিতে দেখিতে তাহার জীবনের সুখদুঃখের কথা স্মরণ করিতে লাগিল।

সকল কথার মধ্যে তাহার জীবনের সেই একটী কথা বিশেষরূপে তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। কথাটী মনে উঠিতেই সে তাহাতে তন্ময়ী হইল এবং দেখিল পর্ব্বতের গাত্রে যেন তাহার আসন্ন পতির অবসন্ন মনের শেষ কথাটী লেখা রহিয়াছে—"ফুলেলা, তুমি বিশ্বাসিনী থাকিও।"

আবার ভাবনার স্রোত ফিরিয়া গেল। ফুলেলার মুখে হাসি দেখা দিল। সে আপন মনে একটু গর্ব্বের সঙ্গে বলিতে লাগিল, "আবার কি। এইত আমার পতির শেষ কথা রক্ষা করিয়াছি। তুচ্ছ ভোগে আর ত এখন একেবারেই বাসনা হয় না। কুকীর হাতে রক্ষা পাইয়াছি; কত রূপবান যুবকের প্রলোভনকে অগ্রাহ্য করিয়াছি, তুচ্ছ ইন্দ্রিয়সুখের যে কোনই মূল্য নাই তাহাও বেশ বুঝিতে পারিয়াছি; এখন আমি আমার সতীত্বের গর্ব্ব করিতে পারি।" বলিতে বলিতে ফুলেলার হৃদয় গর্ব্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ফুলেলার সম্মুখেই একটা মানুষের কঙ্কাল পড়িয়া ছিল। তাহার মধ্যে যেন সহসা প্রাণ প্রবেশ করিল। তাহা ফুলেলার গর্ব্বকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। ফুলেলা বিস্ময়ান্বিতা হইয়া সেই দিকে দৃষ্টি করিল। ভয়ে তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সে হতবুদ্ধি হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি? কি জন্য হাসিতেছ?" কঙ্কাল হইতে শব্দ আসিল "আমি নির্জ্জীব নরকঙ্কাল, তোমার গর্ব্ব দেখিয়া হাসিতেছি। তুমি মনে রাখিও, 'ধূমা উড়ে, উড়ে ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই।' না মরিলে নারীর চরিত্রে বিশ্বাস নাই।"

এ কথায় ফুলেলা বিরক্ত হইল। সে বলিতে লাগিল "আমি আমার মন জানি। ধূমা হইব, ছাই হইব, তার পরে বিশ্বাসিনী হইব, আমি তেমন স্ত্রীলোক নই; আমি বিশ্বাসিনী।" ইহা বলিয়া ফুলেলা উত্থিতা হইল এবং আপন মনে গৃহের দিকে চলিয়া গেল।

ক্রমে আরও পাঁচ বৎসর অতীত হইল। দেশে ভয়ঙ্কর কলেরার প্রাদুর্ভাব হইল। ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। ফুলেলার দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র কলেরার কোলে শয়ন করিল। ফুলেলারও কলেরা হইল। সে ক্রমে হত-চেতনা হইল। ফুলেলার সহোদর তাহাকে জীবনহীন মনে করিয়া হানুতীরে নিক্ষেপ করিয়া, মৃতাবশিষ্ট পুত্র দুইটীকে সঙ্গে করিয়া, আপনার গ্রামে চলিয়া গেল। যাহা কিছু অস্থাবর সম্পত্তি ছিল, গাড়ী বোঝাই করিয়া আপনার গৃহে লইয়া গেল। বণিকের আনন্দের সংসার নিষ্প্রদীপ হইল।

ফুলেলা হানুতীরে পড়িয়া রহিল। শ্মশানসেবী মুদ্দফরাশ (ডোমজাতি) তাহাকে টানিয়া ফেলিতে আসিল। সে দেখিল ফুলেলার দেহে প্রাণ আছে। সে তাহাকে আপনার কুটীরে লইয়া গেল, এবং অত্যন্ত সাবধানে শুশ্রূষা করিতে লাগিল। মুদ্দফরাশের যত্নে ফুলেলা এক মাসের মধ্যে সুস্থ হইল। সুস্থ হইয়া সে আপন গৃহস্থলীর সংবাদ লইল। শুনিল, তাহার সংসার শ্মশানে পরিণত হইয়াছে; তাহার বিত্তবিভব তাহার সহোদর লইয়া গিয়াছে। তাহার অন্তরে দুঃখ ও অনুতাপের অবধি রহিল না। সে নয়নজলে বুক ভাসাইয়া অতীত স্মৃতি ভুলিতে বসিল।

যে মুদ্দফরাশের যত্নে সে জীবন লাভ করিল তাহার প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতা ও অনুরাগ জন্মিল। অন্যদিকে মুদ্দফরাশ ও তাহার রূপমাধুর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইল। সে ফুলেলার মন পাইবার জন্য তাহাকে অধিকতর যত্ন ও আনুগত্য

দেখাইতে লাগিল এবং কাতরভাবে মনের অভিসন্ধি জানাইতে লাগিল। সে বুঝাইয়া দিল কোনও ভদ্রলোকে আর তাহাকে গৃহে তুলিবে না। সে ডোমের অন্নে দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করায়, সভ্য সমাজের অস্পৃশ্যা হইয়াছে। কিন্তু ফুলেলা যদি তাহার হইয়া, তাহার গৃহে অবস্থান করে, সে তাহাকে দেবতার মত অর্চ্চনা করিবে।

ক্রমে কিছুদিন গত হইল। ফুলেলা আপন ভবিষ্যৎ ভাবিতে লাগিল। সে এখন কোথায় যাইবে, কে তাহার সহায় হইবে, হিন্দু সমাজ তাহার দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া তাহাকে কোন্ আসন প্রদান করিবে এবং তাহার আত্মীয় স্বজনেই বা তাহার সম্বন্ধে কি বিচার করিবে, ইত্যাদি চিন্তায় সে অবসন্না হইল। তখন তাহার মৃতপতির শেষ কথা তাহার মনে আসিল না। নর-কঙ্কাল যাহা বলিয়াছিল, তাহাও তাহার মনে পড়িল না। সে প্রাণদাতা বৃদ্ধ-ফরাশের আদরযত্নে তাহার কথায় সম্মতা হইল। তাহার মনমোহিনী হইয়া, পুরাতন খেলা নূতন করিয়া, খেলিতে বসিল। ফুলেলা নূতন সংসারে নূতন গৃহিণী হইল, নূতন সাজে সজ্জিতা হইল, নূতন ধরণে হাসিয়া কাঁদিয়া, নূতন অভিনয় আরম্ভ করিল। ক্রমে তাহার গর্ভে তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল। কন্যা জন্মিবার সময় তাহার প্রাণবিয়োগ হয়।

এই দেশে এইরূপ প্রথা আছে, সন্তান প্রসবের সময় সূতিকাগৃহে মানুষ ও গরুর শির-কঙ্কাল আনিয়া রাখিতে হয়। প্রসূতিকে তাহাদের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়। ফুলেলার প্রসব সময়েও এই সকল, সূতিকাগৃহে রাখা হইয়াছিল।

প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইলে ফুলেলা এই সকল কঙ্কালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। যন্ত্রণায় প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ বয়সে পুনঃপুনঃ প্রসব-বেদনার ভাগিনী হওয়া কি বিড়ম্বনা! কিন্তু তাহার ইচ্ছায় এখন আর কিছু নির্ভর করেনা। কাল তাহাকে এই যন্ত্রণার গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়াছে। সে তখন অনুতাপে জর্জ্জরিতা হইয়া ভাবিতে লাগিল, "কেন আমি মরিলাম না, আমার প্রাণসর্ব্বস্ব পুত্র কন্যা, আমার সোনার সংসার আজ কোথায়, আমি কোথায় ছিলাম, আর আজ কোথায় আসিয়াছি। এই ডোমের ঘরে আসিয়া যখন আমি চৈতন্য লাভ করিয়াছিলাম, তখন আত্মসম্মান রক্ষা করিতে কেন আমি আত্মহত্যা করিলাম না, কেন আমি এই ঘৃণিত গৃহে বিলাসিনী হইলাম। আমি মণ্ডপের প্রতিমা হইয়া আজ প্রেতের আসনে ক্রীড়ারতা – নৃপতির মুকুট-মণি হইয়া আজ মলমূত্রবাহীর ছিন্ন পাদুকা! হায় রে প্রাণের মমতা!"

ফুলেলা নীরবে নয়নধারায় বুক ভাসাইতে লাগিল। মরণে কৃতসংকল্পা হইল। এই সময় তাহার স্বর্গীয় পতির আসন্নকালের কথা মনে পড়িল, "ফুলেলা, বিশ্বাসিনী থাকিও।" সে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "আর থাকিলাম।"

এই সময় নরকঙ্কাল খল্‌খল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। ফুলেলা সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিল। কঙ্কাল হইতে শব্দ উঠিল, "ধূমা উড়ে, উড়ে ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই।" তখন ফুলেলার প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাহার প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিবার সময় বলিয়া গেল, "আমি তাহার সাক্ষী।"

ফুলেলার উপাখ্যান শেষ করিয়া বৃদ্ধা বলিতে লাগিলেন, "চরিত্র বড় প্রধান কথা! মানুষ কেবল মরণের সময় চরিত্রের গৌরব করিয়া মরিতে পারে! না হইলে মানবচরিত্রে একদণ্ডও বিশ্বাস নাই। বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির মরণ সময় পর্য্যন্ত বিপদ ঘটিতে পারে। যে কাম সন্তাড়নে অবিচলিত থাকে সংসারে সেই সাধক, সেই ভক্ত, আর সেই ধন্য।"

বাবাজী বলিলেন,—

"বিজ্ঞান্মহাবিজ্ঞতমোদস্তি কো বা?
নার্য্যা পিশাচ্যা ন চ বঞ্চিতঃ যঃ॥"

আমি বৃদ্ধার উপদেশ ভাবিতে ভাবিতে বিশ্রামস্থানে গমন করিলাম।

প্রথমখণ্ড সমাপ্ত।